অংশ বিশেষ (২।১।১৪) উদ্ধৃত করিয়া এই-রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"সর্ব্ব ব্যবহারাণামেব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ। পরমার্থ দৃষ্টি জন্মিলে তবে লোকে বুঝিতে পারে যে এ জগৎ ব্রহ্মশক্তির রূপান্তর—এ জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই।" নব্য, পৃঃ ৫৭৫।

বিদ্যারত্ন মহাশয় অন্যান্য স্থলে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এখানেও তাহাই করিয়াছেন। যে অংশ গোপন করিলে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই অংশই গোপন করা হইয়াছে। অংশটুকু এই—'স্বপ্ন ব্যবহারস্য প্রাক্ প্রবোধাৎ' অর্থাৎ "জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে স্বপ্নকে যেমন সত্য বলিয়া মনে হয়।" বিদ্যারত্ন মহাশয় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই—'ব্রহ্মাত্ম ভাব জন্মিবার পূর্ব্বে সমুদয় ব্যবহারের সত্যতা উপলব্ধি হয়' সুতরাং সমুদয় অংশের অর্থ এই—"জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে স্বপ্নকে যেমন সত্য বলিয়া মনে হয়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বেও এই জগৎকে সত্য বলিয়া মনে হয়।"

গ্রন্থকার বলিতেছেন 'পরমার্থ দৃষ্টি জন্মিলে, তবে লোকে বুঝিতে পারে যে এ জগৎ ব্রহ্মশক্তির রূপান্তর, এ জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই"। আমরা কিন্তু দেখিতেছি, ভাষ্যের অর্থ ঠিক ইহার বিপরীত। শঙ্করের অর্থ এই যে যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা, ততক্ষণই স্বপ্ন সত্য, জাগ্রত হইলে স্বপ্ন অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তেমনি যতক্ষণ লৌকিক ব্যবহার, যতক্ষণ অজ্ঞানতা, ততক্ষণই এ জগতের সত্যতা; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে, স্বপ্নের ন্যায়, এ সমুদয় অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোকিলেশ্বর বাবু নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য যে সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার মত ত সমর্থিত হইল না বরং তাঁহার বিরোধী মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। অপরাপর বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

কমলাকান্ত কথা লহরী। (৪)

প্রঃ—বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রাণ খুলিয়া বলিতে গেলে হয়ত আমাদের মধ্যে অনেকের নিকট অপ্রিয় হইতে হয়; কারণ আমরা যেরূপে জীবনাতিপাত করিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল লোক খুব কম; যাঁহারা আদৌ চিন্তা করেন না, গড্ডলিকা-প্রবাহে জড়ের মত ভাসিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার কথা রুচির না হওয়াই সম্ভব। তবে যখন আরও কিছু শুনিতে তোমাদের ইচ্ছা দেখিতেছি, তখন সত্যের অনুরোধে কিছু বলিব। আবার আর এক নূতন বিপদ অধুনা উপস্থিত হইয়াছে; রাজপুরুষেরা অপ্রিয় সত্য শুনিতে নারাজ; সেই নিমিত্ত অনেক সুপরামর্শ দিবার যোগ্য ব্যক্তি "সব্ সে চুপ্ ভালা"-নীতি অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাহা হউক, ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে যে কোন হিতকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায়, তাহাতে কখনই কোন বিঘ্ন বিপদ আসিতে পারে না, ইহা যেন কখন বিস্মৃত না

হই, জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। যাহা ভাল বুঝিব, ঠিক বুঝিব, তাহা অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতে যেন কখন দ্বিধা না হয়, এরূপ বল সর্ব্বদা অভয়ার চরণে যাচ্ঞা করিয়া থাকি।

বর্ত্তমানে ভারতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার যে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এরূপ পূর্ব্বেও হইয়াছে। রামরাজ্যের অবসান হইল, কৌরবসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইল, যদুকুল বিনষ্ট হইল, পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন, ত্রেতাদ্বাপরের কাল পূর্ণ হইল, কলিযুগের প্রারম্ভে সেই এক ঘোর অন্ধকার আসিয়া কর্ম্মভূমি ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহার বহুদিন পরে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় আর একবার ভারতমাতাকে দারুণ অরাজকতার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। আর আজ সুসভ্য সুদক্ষ বৃটিশ শাসনাধীনে আমরা এই মহা বিভ্রাটে পতিত হইয়াছি। অধুনা রাজার পক্ষেও বিষম সমস্যা, প্রজার পক্ষেও বিষম সমস্যা উপস্থিত। রাজপুরুষগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত কেবলই পরামর্শ করিতেছেন, কি উপায়ে রাজ্যে শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়, প্রকৃতিবর্গও ভাবিতেছেন, হঠাৎ কেন এরূপ গোলযোগ আসিয়া সকলকে চিন্তাকুল করিল।

কি জানি কোন্ ভ্রমে পতিত হইয়া রাজপুরুষেরা, প্রকৃত কারণানুসন্ধানে বিরত থাকিয়া, কেবলমাত্র দুর্লক্ষণগুলির আশু চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, অসন্তোষ অশান্তির বাস্তবিক কোন হেতু নাই, শুধু জনকতক কুশিক্ষিত দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধি দ্বারা হঠাৎ এবম্বিধ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, কঠোর ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করত তাহাদিগকে পেষণ করিলেই আর কোন প্রকার শঙ্কার কারণ থাকিবে না। পরন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এই মোটা কথাটা আদৌ বুঝিতেছেন না যে, দেড়শত বৎসর-কালব্যাপী শাসনের পর অকস্মাৎ এরূপ কেন ঘটিল। জনকতক কুচক্রীর কথায় কি এতই বল যে, এই নিরীহ শান্ত বাঙ্গালী জাতি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, তাহাদের কুহকে পড়িয়া কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান একেবারে হারাইয়া ফেলিল। যাহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, যাহারা এখনও বিচারাধীন, ইহারা সকলেই কি নিরেট মূর্খ, ঘোর আহাম্মোক যে কেবলমাত্র হুজুকে পড়িয়া আপনাদিগকে এরূপভাবে ক্রোধান্ধ সিংহের কবলে ফেলিতে দ্বিধা করিল না? নিতান্ত বাতুল ভিন্ন এমন কাজ কি মহা বর্ব্বরের দ্বারাও সম্ভবে?

আমাদের অপেক্ষা অনেক বিজ্ঞ ভারতীয় ও বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা এবিষয়ে নানা রূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে স্থলে আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক হইতে যে কোন নূতন কথা বাহির হইবে, সে আশা করিওনা। আমি যে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা। যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক প্রজা যদি আপন আপন বুদ্ধিবিদ্যা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ সময় রাজপুরুষগণকে পরামর্শ দ্বারা সাহায্য না করেন, তাহাতে প্রত্যবায় আছে। যদ্যপি কেহ মনে করেন যে, রাজা, রাজপুরুষ বা রাজজাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, সুতরাং অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ কি? তদুত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শুধু পার্থিব রাজাদির কাছে

ত আমাদের দায়িত্ব নয়, সেই রাজার রাজা বিশ্বরাজের সমক্ষে আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করিয়া না চলিলে ইহ-পরলোকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে। সকলকে ফাঁকি দেওয়া যায়, যমকে ফাঁকি দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়, সেই যমের যিনি যম, যাঁহার ভয়ে যম সদা সশঙ্কিত, তাঁহার ন্যায়দণ্ডের সম্মুখে ব্রহ্মাকেও অবনতমস্তক হইতে হয়, পার্থিব সম্রাটাদি কোন্ ছার!!!

বর্ত্তমান গোলযোগ যদি শুধু একটা আসুরিক ব্যাপার হইত, ইহার প্রতিকার সহজ ছিল, বিশেষ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশরাজের পক্ষে। ভীষণ সিপাহীবিপ্লবের লকূলকায়মান বহ্নি যাহারা "নিবাইল, তীব্র প্রচণ্ড দাপে" তাহাদের নিকট মুষ্টিমেয় ভারতীয় অপদার্থ প্রজার পাশবশক্তি নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়, সন্দেহ নাই। সম্মুখ-সমরে লালমুখের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া, জ্বলন্ত হুতাশনে পতঙ্গের ন্যায় আহুতি দেওয়া যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেই কালা আদমীর ওরূপ দুঃসাহিসকতা প্রকাশ করা চলে। যাঁহারা কল্পনাতেও উক্তরূপ আশঙ্কা করেন, তাঁহারা বাতুল অপেক্ষাও বাতুলতর। আমরা যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তাহাতে বুক ঠুকিয়া বলা যাইতে পারে, যে সহস্র বৎসরের মধ্যেও ভারতবাসীর সেরূপ ক্ষমতা, যোগ্যতা, পরাক্রম হওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। পরন্তু অধুনা যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে হইবে যে, এই ধূমাচ্ছাদিত অনল লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া যে হঠাৎ এখান সেখান হইতে এক একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, ইহার কারণ নিগূঢ় এবং তাহা বাহিরের দুদশ কলসী জলে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। ইণ্ডিয়ান-ডেলি-নিউস পত্রিকা সেদিন যথার্থই বলিয়াছেন, "We are firmly persuaded that the only right and efficacious mode of dealing with the situation is to attack the causes of discontent"—অসন্তোষের কারণসমূহ বিদূরিত না হইলে অশান্তি ঘুচিবে না, রোগের নিদান অর্থাৎ মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া, যিনি হাতুড়ের মত চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তাঁহার ঔষধাদিতে কিরূপ প্রতিকার হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। প্রকৃতিবর্গ নানা কারণে ঘোর অসন্তোষের পীড়া ভোগ করিতে থাকিল, তজ্জন্য কোন প্রকার চেষ্টা হইল না, তন্নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না, কেবল লাঠির চোটে তোমাদের বেদনাসম্ভূত কান্না থামাইবে, এরূপ বিবেচনা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? সহৃদয়তা, সহানুভূতি দূরে থাকুক, কেবল দুনিয়াদারীর লাভলোক্সান গণনাতেও এবম্বিধ ব্যবস্থা অতীব দোষের। তাই ভাবি, স্বাধীনতার জন্মভূমি বত্নপ্রসূ শ্বেতদ্বীপ কি আজ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত-শূন্য? ব্রাইট, গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সঙ্গে কি দয়াধর্ম্মের রাজনীতি ইংলণ্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? আর কাহার দোষ দিব? আমাদেরই দুরদৃষ্টবশতঃ বৃটিশজাতির এ প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে; নতুবা এই সোজা কথাটা বুঝিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? রাজপুরুষদের কি মোহই উপস্থিত হইয়াছে যে, এক ভুল চাপা দিতে গিয়া আর এক ভুল করিতেছেন, ঐরূপে তৃতীয় ভুল, ক্রমে ভুলের পর ভুল; ভুলে ভুলে যে এদিকে হুলস্থূল হইতেছে, তাহার আদৌ খেয়াল নাই। ভুলের সঙ্গে জিদ্ জুটিয়া কোন কোন স্থলে কতকটা গোঁয়ারের মত কাজ হইতেছে, কাজেই আমাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে যে এদিকে মহাস্বার্থে

ব্যাঘাত জন্মিতেছে, তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। বিলাতের কাগজওয়ালারা কেহ বলিতেছেন, জোর জবরদস্তী দ্বারা দলন ভিন্ন দমনের প্রকৃষ্ট উপায় নাই :—

"What is needed above all is a stern interval in which the agitators shall feel the weight of our hand." (Daily Telegraph)

কেহ প্রকাশ করিতেছেন, অজস্র রক্তপাত আবশ্যক হইয়াছে :—It is just possible that some blood-letting on an extensive scale may become necessary." (Globe)

ইঁহারা কেহই ভারতের প্রকৃত অবস্থা মোটেই জানে না, জানিবার অবকাশও কখন পান নাই; কেবল কতকগুলি নীচাশয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির অতিরঞ্জিত কথায় পরের মুখে ঝাল খাইয়া এরূপ প্রলাপবাক্য উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই বা কি দোষ দিব, সাত সমুদ্র তের নদী পারে বসিয়া তাঁহারা সুদূরবর্ত্তী সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রাজ্যের সংবাদ যেমন শুনিতেছেন, তেমনি মতামত জাহির করিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতেছেন, যাঁহারা এখানে বসিয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধারের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাই যখন ভ্রান্ত প্রমত্তের ন্যায় হুকুম জারি করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তখন অব্যবসায়ী অজ্ঞ বলদৃপ্ত আত্মম্ভরি বিলাতী সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণকে আর কি বলা যায়! বড়লাট মিণ্টো বাহাদুর বঙ্গব্যবচ্ছেদের অব্যবহিত পরেই এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তদবধি এই অশান্তি-আন্দোলনের আগাগোড়া বেশ ভাল করিয়াই দেখিতেছেন, পরন্ত দেখ, তাঁহারই কেমন ভুল :—"A poisonous seed has been sown in India hitherto foreign to the soil. It has grown up into a noxious weed. We must dig it up and cast it out." এই তাঁহার শেষ উক্তি। এই বিষবৃক্ষ এ দেশের জিনিস নয়, এখানকার মৃত্তিকা উহার অনুকূল নহে, উহা বিদেশের আমদানী, তথা হইতে বীজ আসিয়া এখানে অঙ্কুরিত এবং অবশেষে অপকারী আগাছায় পরিণত হইয়াছে, শিকড় বসিয়াছে, সুতরাং সমূলে উৎপাটিত ও দূরে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। বেশ কথা, আমরাও তাহাই চাই; অরাজকতা উপদ্রবাদি কে ভালবাসে? পান্তা ভাত বাতাস দিয়া খাই, তবু হেঙ্গামে যাই না। এদেশের শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন, সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, নির্ঝঞ্ঝাটে আরামে থাকিতে চায়। পথে একটা ধর্ম্মের ষাঁড় দেখিলে আমরা বিশ হাত তফাৎ দিয়া যাই, বক্রবিষাণ মহিষ সম্মুখে আসিলে অনেকের মূর্চ্ছা হয়। আমাদের উপদেষ্টারা বলিয়া গিয়াছেন "শতহস্তেন বাজিনা" "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ"—একটা ঘোড়া দেখিলে তাহার শত হস্ত দূরে থাকিবে, কি জানি যদি পিছ্‌লি ঝাড়িয়া মাথাটা গুঁড়া করে, আর দুষ্ট লোকের সংশ্রব অপেক্ষা স্বস্থান ত্যাগ করাও শ্রেয়। আমরাও প্রাত্যহিক জীবনে ঠিক তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আসিতেছি। সুতরাং হুড়াহুড়ি, গুতাগুতি, মারামারি, কাটাকাটির দৃশ্য পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে দুর্বিসহ। এক্ষেত্রে লাট্ সাহেবের বিভীষিকার ওজনটা মাপা যাউক। উনি আমাদের সম্রাটের প্রতিনিধি, সসাগরা সদ্বীপা ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, জগদীশ্বর উঁহার হাতে আমাদের ধনপ্রাণ ন্যস্ত করিয়াছেন, উঁহার কৃপাদৃষ্টি হইলে, আমি কমলাকান্ত, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হইয়াও, নবুন্নার রাজতক্তে বসিতে পারি, আবার উনি কটাক্ষ করিলে আমাকে

চিরকারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়, এমন কি, আমার প্রাণ সংহার পর্য্যন্ত উঁহার এক তুড়িতে সম্পন্ন হইবার কথা। আসমুদ্র হিমগিরি পর্য্যন্ত ভারতে দিল্লীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত বাদশাহগণের যে শক্তি ছিল, ইঁহার বিক্রম তদপেক্ষা অনেক বেশী; আকবর আওরঙ্গজেব প্রভৃতি সহস্র চেষ্টাতেও যে সকল দেশীয় নৃপতিকে বশে আনিতে পারেন নাই, ইহার ইঙ্গিত মাত্রে তাহারা এখন উঠিতেছে, বসিতেছে, এক কথায় ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ইহার লাটত্বের নিকট হীন প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এহেন মহামহোচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তির কথাটা ছুড়িয়া ফেলিবার যোগ্য হইতেই পারে না। তবে কিনা বিষম পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার ঘোষণার মধ্যে কোটি কোটি নিরীহ নির্দ্দোষী রাজভক্ত প্রজার অভাব ক্লেশাদি বিমোচনের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় দশটা বেশ গোছাল রকমের কথার সঙ্গে অবান্তর প্রসঙ্গের মত ঐ কয়টী ভীতিসঞ্চারিণী শাসন বাক্য থাকিলেই ভাল দেখাইত; তর্জ্জন গর্জ্জনময় কর্কশ কর্জ্জনের ভাব মৃদু মিণ্টোতে শোভা পায় না। শুধু ঐ গরল গাছই কি ভাবনার বিষয় হইল? তজ্জন্য একটু উদ্বেগ ভোগ করিতে হইতেছে বলিয়া কি উহাই প্রথম ও বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়? বিধাতা কর্তৃক বিন্যস্ত ভার এই ত্রিশ কোটি প্রজার আর্ত্তনাদ কি আজও তাঁহার কাণে পঁহুছে নাই? অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া, প্লেগাদি দ্বারা নিয়ত প্রপীড়িত দুর্ব্বল অসহায় পদানত প্রকৃতিবর্গের মতামত উপেক্ষা করত নানারূপ দুর্ব্ব্যবহার সহকারে তাহাদের মর্ম্মে যে এতকাল দারুণ আঘাত দেওয়া হইতেছে, তাহা কি রাজপ্রতিনিধির প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় নহে? তাহার প্রতিকারের উপায় বিধান কি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য নয়? এই সকল বিবেচনা করিলে কি লাট্ মাহাত্মার উক্তির প্রতি একদেশদর্শিতা দোষ আরোপ করা যায় না? শ্বেতকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষে প্রজামাত্রেরই হিত চেষ্টা দ্বারাই প্রকৃতিরঞ্জন সম্ভবে; সেটী যদি না দেখিতে পাওয়া যায়, প্রজাপালন রূপ রাজধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে বলি কি প্রকারে?

আরও দুই চারিটী প্রশ্ন এস্থলে করিলে অপ্রাসঙ্গিক হয় না। এত বড় গুরুতর ব্যাপার, এই কালকূটের আমদানী কি সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ খ্রীষ্টশিষ্যময় ইউরোপখণ্ড হইতে হয় নাই? সেখানে যত্রতত্র বিস্তর ফলফুল-শোভিত বিষবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, তবেত অনায়াসে বীজ পাওয়া গিয়াছে। সমবেত খ্রীষ্টানজগতের প্রবলপরাক্রমেও যখন তাহা বিনষ্ট হয় নাই, তখন কাহার স্কন্ধে কিরূপ দোষ চাপাইব ভাবিয়া ঠিক পাই না। পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুমোদিত শাসনপ্রণালীর ফল যদি অবশেষে নাইহিলিজম্, এনার্কিজম্, ফিনিয়ানিজম্ প্রভৃতি কালসর্পিজম্ হয়, তবে বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!!! উক্ত বীজ কোন্ জাহাজে কোন্ পথে কবে এদেশে আইল? কে আনিল? কেন আনিল? এতদিন বা কেন আসে নাই? এবম্বিধ গুরুতর প্রশ্নাদির উত্তর কে দিবে?

অতঃপর আর একদিক্ দেখা যাউক। খুনজখম গুপ্তহত্যাদি ত নূতন কথা নয়। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চুড়িডাকাতী, লুটপাট, খুনধারাপী প্রভৃতি অপরাধের নানারূপ অভিনয় হইয়া আসিতেছে। রাজপুরুষহত্যাও অধুনা অভিনব ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত নহে; শ্বেতাঙ্গরাজ্যসমূহে উহা ত নিত্য ঘটিতেছে।

আমাদের দেশেও ১৮৭১।১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি নর্ম্মাণ সাহেব ও বড়লাট মেওু বাহাদুর আততায়ী হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হ'ন। ওরূপ দুর্ঘটনা ইংরাজভারতে পূর্ব্বে কখন হয় নাই, ভরসা করি, ভবিষ্যতে আর হইবে না। কিন্তু তখন ত রাজজাতির মধ্যে এত হৈচৈ শুনা যায় নাই, এবম্বিধ ভয়ভাবনা বিভীষিকার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। এখনই বা এরূপ ভয়ঙ্কর হট্টগোলের কারণ কি? তবেই তথ্য-কথায় গিয়া পড়িতে হইতেছে। তখন যে কারণে ঐ দুই মহোদয় নিহত হয়েন, তাহা এবং আধুনিক কারণ ইত্যাদির মূলে যাহা বিদ্যমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে,উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে, এইরূপ অনুমান অনেকে সঙ্গত বিবেচনা করেন। এইখানেই ধীর প্রণিধান, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, সূক্ষ্ম বিচার ও নিরপেক্ষ মীমাংসার প্রয়োজন। আবদুল্লা ও শের আলী ব্যক্তিগত স্বার্থহানি-জনিত হতাশাবস্থায় উন্মত্তহৃদয়ে নরহত্যা করত ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল, কি কোন সম্প্রদায়বিশেষের হিতেচ্ছায় নিজেদের প্রাণ আহুতি দিয়াছিল, তাহা প্রকাশ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, সে সময় ওয়াহাবী মতাবলম্বী মুসলমানশ্রেণীর প্রতি রাজবিদ্রোহাপরাধে শাসনবজ্র প্রযুক্ত হইতেছিল। পরন্তু সেই হুলস্থূল ব্যাপারের কালে,এই ভীষণ কাণ্ডদ্বয় ঘটিলেও,রাজাজ্ঞায় জনসাধারণের প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা প্রচারিত হয় নাই, বরং মুসলমান প্রজাকুলের উপর রাজপুরুষগণের কথঞ্চিৎ অনুগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহাদের শিক্ষোন্নতির দিকে রাজদৃষ্টি যেন তৎকাল হইতে একটু খরতর বোধ হইতেছে। এবার কিন্তু যাহারা অত্যাচার উপদ্রবাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কারাবাস, নির্ব্বাসন, প্রাণদণ্ড, আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাদের দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বিজ্ঞাপিত যে তাহাদের নিজেদের বা বিশেষ কোন দলের কোন প্রকার স্বার্থরক্ষা তাহাদের লক্ষ্য নহে, সমগ্র ভারতের নানাজাতীয় উৎপীড়িত প্রজানিচয়ের ক্লেশ বিমোচনোদ্দেশে দেহ প্রাণ সমর্পণ করত তাহারা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছে। এবম্বিধ দুষ্কার্য্যকলাপ যে শিষ্টজনোচিত নহে, এবং একপ কুপ্রথাবলম্বনে যে কুফল বৈ সুফলের আশা নাই,ইহা আমরা ত বিশ্বাস করিই, বিপ্লবকারীরাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নয়; অথচ তাহারা কিছুতেই এ পথ ছাড়িতেছে না। এই অদ্ভুত রহস্য ভেদ করে কে? উহারা কি ভাবিয়া কি কাজ করিতেছে, উহারাই জানে, আমাদের তাহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। রামের লীলা রামই বুঝেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও সম্যক বুঝিবার সাধ্য কোথায়? উহাদের জন্ম, বয়স স্বভাব, প্রকৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা এবং শরীরমনের অন্যান্য অবস্থাদি কিরূপ, তাহা আমরা আদৌ জানি না, সুতরাং উহাদের ভিতরকার খবর আমাদের গোচর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তদ্ব্যতীত সংসারের নিয়মই এই যে,বেদে ভিন্ন সাপের হাঁচি অন্যে চিনিতে পারে না। শিল্পী শিল্পীকে চিনে, বণিক্ বণিকের হাবভাব বুঝিয়া থাকে, বীর বীরোচিত গুণাবলীর মর্য্যাদা জানে, এই প্রকারে যে যতটা যাহার সমভাবাপন্ন, সে ততটা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, অন্যের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য। তবে কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল গুণ বা উৎকট দোষ দেখিলে সাধারণের কিয়ৎপরিমাণে বিচার করিবার অধিকার আছে।

উল্লিখিত বৈপ্লবিক যুবকগণ যে একদম অনভিজ্ঞ, তাহাব প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে, উহাদের মস্তিষ্ক যে সংসারের সাধারণ জীবের ভাবে বিকশিত নয়, তাহাও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, হ্রস্বদীর্ঘবোধ এবং সতর্কতার সম্পূর্ণ অভাব প্রত্যেক কার্য্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা দূরে থাকুক, একটা বিকট রকমের হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া জলন্ত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিবার দুঃসাহস যে বিলক্ষণ আছে, তাহা আব দেখাইয়া দিতে হইবে না। এবম্বিধ বহুতর দোষত্রুটি সত্বেও, নিজেদেব আলোকানুযায়ী আত্মবলিদানে তাহারা যে শ্রেণীর তৎপরতা দেখাইতেছে, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; প্রাণদণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং দণ্ডগ্রহণকালে দুইজন যেরূপ চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহা অত্যদ্ভুত; ইহা শত্রুমিত্র উভয়েই বিশেষরূপে লক্ষ্য কবিয়াছেন; তাহাদের অন্তিমকালের মানসিক তেজ ও হৃদয়ের বল দেখিয়া সকলকেই অবাক্ হইতে হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা আলোচনা না কবিলে দোষের হয়। অধুনা ইংরাজজাতি তাঁহাদের পূর্ব্ব মহত্ব অনেকটা হারাইয়াছেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেকের মুখে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তবুও তাঁহারা যে ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া শতমুখে গুণীর গুণের বাহবা দিতে পরাঙ্মুখ নহেন। বিশেষ যেখানে মনুষ্যত্বের প্রবল পরাক্রম পরিলক্ষিত হয়, সেখানে সহস্র ক্ষতির আশঙ্কা থাকিলেও যে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিহারি দিতে বিরত হ'ন না, তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দেখ, এই দুঃসময়ে স্বজাতিব নিন্দা গ্লানি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাইওনিয়র নরেন্দ্রবধোপলক্ষে ঘাতকদ্বয়ের শৌর্য্য ও আত্মোৎসর্গের কীর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। "শত্রোরপি গুণাবাচ্যাঃ"—এই নীতি জনবুল যে সর্ব্বদা অনুসরণ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাব কম উদারতার পরিচায়ক নহে। অন্যান্য শ্বেতকায় কাগজওয়ালারা দুনিয়াদারীর অনুরোধে এবং পোড়াদেশেব হাওয়ার গুণে জাতীয় স্বভাবটী চাপা দিযা হজগজ করিয়া সারিলেন, কিন্তু একজন কিছুতেই বৃটিশ মহানুভবতা দাবাইয়া রাখিতে পারিলেন না। যাহা হউক, পাইওনিয়ব মহাত্মা সমগ্র ইংরাজ জাতির মুখ রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তিনি উঁহাদের ধন্যবাদার্হ, আমবাও উঁহাব নিকট কৃতজ্ঞ যে, উনি এই পতিত জাতির একজন নরহন্তার ভিতরেও সুখ্যাতির যোগ্য মহদ্‌গুণ দেখিতে পাইয়াছেন এবং আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—আমবা ত গুণের প্রতি অন্ধ।

আমবা পরলোক-বিশ্বাসী জন্মজন্মান্তরবাদী, মৃত্যু আমাদের পক্ষে আকাশ কুসুমবৎ একটা শব্দ মাত্র, এই শিক্ষা যিনি নিজে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদান করিয়া যান, তিনি পূজার্হ, সন্দেহ নাই, কিন্তু কয়জন তাহা পাবে? সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণ অনেকে এবম্প্রকারে আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, পরন্তু গৃহস্থ বালকে যে ওরূপ উদাহরণ দেখাইতে সক্ষম হয়, ইহা নূতন সংবাদ বলিতে হইবে।

প্রঃ—এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? রাজাই বা কি করিবেন?

উঃ—জনকতক লোক ক্ষেপিয়াছে মাত্র, সমগ্র দেশ ত স্থির আছে। আমাদের

কর্ত্তব্য রাজপুরুষগণকে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা পাওয়া, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য আমাদের সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা। কেবল নিজের চাকর বাকরদের সঙ্গে যুক্তি করিলে ত কোন ফল হইবে না, আর তাহারা জানেই বা কি। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এদেশের খবর কিছুই জানেনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একটা গল্প বলি, গল্প নয় প্রকৃত ঘটনা। একজন পুরাতন জজ, তিনি শেষে হাইকোর্টের বিচারাসন শোভিত করিয়া অতি অল্প দিন হইল পেন্সন লইয়া দেশে গিয়াছেন, বাস্তবিকই একটা দেওয়ানী মকর্দ্দমার সাক্ষীর এজাহারে লিখিয়াছিলেন "গোপালজীর ভোগের জন্য সন্ধ্যা কালে আধসের মুরগি লাগে" * কথাটা এই যে সাক্ষী "মুড্‌কির" উল্লেখ করিয়াছে, উনি নিজের খাদ্যের হিসাবে "মুরগি" বুঝিয়াছেন, এ জ্ঞান নাই যে, ব্রাহ্মণের বাড়ীর বিগ্রহ, হিন্দুর অখাদ্য মুরগি কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন!!! এবম্বিধ অজ্ঞ সব্‌জান্তাগণের নিকট দেশের লোকের অবস্থা সম্বন্ধীয় যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইবে, তাহার মূল্য বুঝিয়া দেখ।

প্রঃ—মোটামুটি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য বলিলেন, তাহা ত বুঝিলাম। বিশেষ কিছু বলেন ত কৃতার্থ হই।

উঃ—হরিপদে চিন্তা রাখিয়া জীবনতরী ভাসাইয়া যাও, তদ্ভিন্ন এই হতভাগ্য দেশে আর কি করিতে পার? শাস্ত্রে আছে—

"যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা
ভক্তি স্তৎপদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি
কা চিন্তাঃ মরণে রণে॥"

* One pound of chicken.

বাস্তবিক যদি ভগবানের চরণে চিন্তা রাখিয়া চলা যায়, বিষম আপদ বিপদ, এমন কি যুদ্ধে মৃত্যুতেও ভয়ভাবনা হয় না। হৃদয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য হরিভক্তিই প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়; যত কিছু কষ্ট, দুঃখ বেদনা, যাতনা কউক না, ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস থাকিলে কিছুতেই কিছু করিতে পারে না।

প্রঃ—কিছু বিস্তারিত রূপে বলুন।

উঃ—দুরন্তবীর্য্য বিশ্ববিধাতার লীলাবলী অগম্য অপার! সেই অদ্ভুত লীলাচক্রের অধীন হইয়া আজ আমাদের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত! লীলারসময়ের লীলাবলিতে একটা খামখেয়ালী যা-ইচ্ছা-তাই কাণ্ড বুঝিতে হইবে না, তাঁহার সকল ব্যাপারই সুপ্রণালীগত, কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত। ভারতবর্ষের আধুনিক লীলারহস্য-ভেদ করিবার চেষ্টায় কারণানুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বর্ত্তমান দুর্ব্বিপাকের মূলে আমরা নিজেই, ইহার আগাগোড়া আমাদেরই স্বকৃত কর্ম্মফল। অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করত মুক্ত হইবার চেষ্টা দুর্ব্বল হৃদয় জীবের ধর্ম্ম, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে আমাদের শত্রু আমরা নিজেরাই। কথায় বলে দিগ্বিজয়ী রোম আগে আপনাকে আপনি পরাজয় করিয়াছিল, পরে বর্ব্বর জাতিনিচয় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। বাস্তবিক তাই, নিজে যদি ষোল-আনা ঠিক থাকিতে পারি, কাহার সাধ্য আমার অঙ্গ-স্পর্শ করে? তাই বলিতেছিলাম, আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির মূলীভূত কারণ আমরা নিজেরাই, তজ্জন্য অপর কেহ দায়ী নহে।

সংসারে আমরা যে উদ্ভিদ্ পশ্বাদির মত

জীবন যাপন করিতে আসি নাই, এ কথা আমাদের মধ্যে অনেকেই সম্পূর্ণ বিস্মৃত। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"Life is something more than eating, drinking, begetting children and accumulating money."

অর্থাৎ পানাহার, অপত্যোৎপাদন ও ধনসঞ্চয় ব্যতীত মানব জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। শুদ্ধ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিলে চলিবে না, মনুষ্যত্বের দিকে, দেবত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। এই মহাসত্য ভুলিয়া যে দিন আমরা আদর্শ-হীন ভাবে কলুর বলদের মত কালক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত, দুর্দ্দশার আরম্ভ, যাহা অধুনা প্রায় চরমে পঁহুছিয়াছে। যে মানুষের সম্মুখে সর্ব্বদা কোনরূপ উচ্চ আদর্শ নাই, সে নিতান্তই হতভাগা, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সাংসারিক প্রয়োজনাদি সুচারু-রূপে সাধন করিতে ব্যস্ত, সে নিতান্তই কৃপা পাত্র, মানব-সমাজের খাতা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া উচিত। মানুষে দেব-ভাব ও পশুভাব,উভয়ই বিদ্যমান। দেবভাবের অঙ্কুর ও পশুভাবের পরাকাষ্ঠা এই দুই উপ-করণে গঠিত হইয়া ক্রমে পশুত্ব বর্জ্জন করত দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য মানুষ নিয়োজিত। যে ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা না ঘটিতেছে, সেইখানে জানিতে হইবে উৎকর্ষের চিহ্নও নাই, অবনতির উল্টা স্রোত প্রবাহিত। যদি আদর্শ মহৎ হয়, উন্নতি অনিবার্য্য,আর ইন্দ্রিয়-প্রীতিকামনা মাত্র যদি উদ্যমের কারণ হয়,তাহা হইলে দেবোপম গুণাদির প্রাপ্তি সম্ভাবনা দূরে থাকুক, জঘন্য পশুত্বেরই পূর্ণলীলা প্রকটিত হইবার কথা। জগতের সমক্ষে হীনাৎহীনতর হইয়াও নরা-কারে পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ দ্বারা কৃত-কৃতার্থ হইব,ইহা যাহার দুর্ল্লভ জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সে কি কৃমিকীটাদি নিকৃষ্ট জীবাপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর নহে? সমগ্র সংসার দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও যাহার হৃদয়ে ঘৃণালজ্জার উদ্রেক না হয়, সে কি কখন মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে? হাত, পা মুখ, চোখ, নাক মানুষের মত হইলেও আমাদের ভিতরে যাহা আছে, তাহাকে কাহার সাধ্য মানুষ বলিয়া চিনিয়া লয়? মানুষ ব্রহ্মের সন্তান, ব্রহ্মত্ব লাভ তাহার চরম গতি, সুতরাং যাহার ভিতর হইতে একটু সামান্য ব্রহ্মজ্যোতির আভাসও ফুটিয়া না বাহির হয়, তাহাকে ব্রহ্মসন্তান বলিয়া কি প্রকারে চেনা যায়? ক্ষুদ্রের সন্তান হইয়া হৃদয়ে যদি মহৎ হইবার প্রবল আশা আকাঙ্ক্ষা রাখে, তাহার মুখে মহত্বের ভাবের একটা আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আর মহতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মফলে ক্ষুদ্রাৎ-ক্ষুদ্রতর হইবার পথে গড়াইয়া নামিতেছে, তাহার মুখচ্ছবি দেখিলেই একটা বিকট রকমের বীভৎস ভাবের উদয় না হইয়া যায় না। এই শ্রেণীর জীবের কথা ভাবিলে পাষাণ ফাটিয়া যায়; ইহারা চরিত্রবলের অভাব হেতু সম্পূর্ণ ভাবে মানসিক তেজো-হীন, আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাস নিবন্ধন দেহ নাশের ভয়ে জড়সড়, জীবিত থাকিয়াও তাহারা প্রত্যহ দশবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

এরূপক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, হৃদয়ের বল সঞ্চয় করিবার চেষ্টা। সত্যের প্রতি নিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা না জন্মিলে, আত্মার অমরত্বে অনন্ত বিশ্বাস না হইলে, মনুষ্যত্ব লাভ

অসম্ভব; আর মনুষ্যত্ব না পাইলে শক্তি কোথা হইতে আসিবে? সত্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা হইলেই সত্যস্বরূপের প্রেমময় রূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে; তখন দেখিবে যে, নিজের অপেক্ষা পরের জন্য জীবনধারণেই প্রকৃত সুখশান্তি ও বলবিক্রম, আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিবে যে, পরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারিলে আরও উচ্চে উঠা যায়। দধীচি প্রভৃতি বহুবিধ মহাত্মার আত্মোৎসর্গের কথা পুরাণাদিতে আছে। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ একবার দেখাইয়াছিলেন, এক কপোতদম্পতী অতিথির সেবার্থ কি প্রকারে প্রফুল্লচিত্তে তনুত্যাগ করিয়াছিল। সে আখ্যায়িকাটী বড়ই মনোহর।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

কামনা।

হে জনমভূমি!
সাধ হয়, মোর প্রাণ, হৃদয়, চেতনা
তোমার মাঝারে দিয়ে জাগাই তোমারে;
আমারে দশাংশ করি সম দিগঙ্গনা,
চিরদিন ঘিরে রাখি তোমা একবারে;
আমার হৃদয়-রক্ত করিয়া বাহির,
তোমার শিরার মাঝে দিই বহাইয়া;
নিঙ্গাড়িয়া শেষ বিন্দু তপ্ত অশ্রুনীর,
তোমার নিরুদ্ধ অশ্রু তুলি ফুটাইয়া,
মেঘ বক্ষে রবি ক্ষুদ্র তারকা যেমন
আপনারে ঢেকে দেয়; অক্ষম দুর্ব্বল
তেমতি চরণ তব করি আলিঙ্গন,
তোমাতে ডুবিয়া যাই পুলক-বিহ্বল।
জন্মি তব বুকে, তোমা দেখিনু প্রথম,
গৃহান্তরে যে'ত মাতা ফেলে মোরে একা,
তখনি তোমার গাঢ় স্নেহ অনুপম
দিকে দিকে শত রূপে পাইতাম দেখা।
তোমারি ধূলির মাঝে রয়েছে গোপন
কত মান, অভিমান, কত অশ্রু, হাস্
কিরণে অনিলে তব, শৈশব স্বপন
জড়াইয়া আছে তার ক্ষীণ বাহু পাশ।
তোমার ও সন্ধ্যাকাশে ব্যাপ্ত কত গান,
তোমার তটিনী জলে কতই রাগিণী,
স্মৃতির কপাটে চুপে পেতে দিলে কাণ,
আজো তার সেই স্বর প্রাণে প্রাণে শুনি।
জোছনা, আঁধারে ওই নীরদ মালায়,
জীবনের সুখ দুঃখ মিশেছে আমার,
বাতাসে সুবাস সম অবিচ্ছেদ্য কায়—
সারা প্রাণে হু হু রবে বহে অনিবার।
আজি এই দূরস্থিত প্রবাসী হৃদয়
প্রতিদিন একবার যে'য়ে ফিরে আসে,
তোরি কাছে কাছে মাগো! ব্যথা অশ্রুময়
বাহিরিয়া শ্মশানের কোন্ দীর্ঘশ্বাসে।
বুঝিয়াছি আমি তোর অণু পরমাণু,
একান্ত তোমার আমি, গেছি মোরে ভুলি,
ভক্তিভরে তোরি পায় পাতিলাম জানু,
হীন শিরে দে'মা! তুলি চরণের ধূলি।
আমারি শিথড় গুলি তোরি সারা গায়
বর্ম্ম সম ব্যাপ্ত হোক্; গরবে ভুলিয়া
কেউ যদি পশু বলে আঘাতে তোমায়,
উৎপাটিত হ'য়ে আমি পড়িব ভাঙ্গিয়া
তারি'পরে, ফিরে যদি দাঁড়াতে না পারি,
শ্রান্ত বাহু তোরি পদে জড়াইবে মম,
জন্ম জন্মান্তর র'বে কঙ্কালের সারি
শত্রু দেহ বিঁধিবারে কণ্টকের সম।
দেবতা আমার আছে কোথা কোন্ দূরে

লুকাইয়া আপনারে মাগো! তোরি ঠাঁই,
তোমার ভিতর দিয়া, তব অন্তঃপুরে,
তাঁহারি স্নেহের আঁখি দেখিবারে পাই।
তটিনীর উর্ম্মিতলে, মলয় বাতাসে,
বরষা, বসন্তে, মেঘে, প্রদোষ প্রভাতে,
তোমারি মূরতি ধরি আসি মোর পাশে,
নিতি সে নেহারে মোরে তোমারই সাথে।
স্মরিয়া নামটী তাঁর, দেখেছি তোমার,
মনমাঝে অপরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর;
তোমারি নিঝর তানে, বিহঙ্গ গলায়
শুনিয়াছি সুধা সম তাঁরি কণ্ঠস্বর।
তব প্রতি অঙ্গে পাই তাঁহারি আভাষ,
বিশ্ব-বিশ্বেশ্বর, দোঁহে মিশে চিরন্তন—
তোমাতেই করে যেন সদা স্বপ্রকাশ,—
সাকার ও নিরাকার—স্রষ্টা ও সৃজন।
জীবনে তোমার কাজে হ'ব ম্রিয়মান
বাজিবে যখন তব কাঁশী ঘণ্টা রণভেরি,
নানা উপচার সাথে দেখিবে শয়ান
বিশ্রান্ত হিয়া ও পদে, উঠিছে শিহরি।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

ইউরোপীয় দর্শনের উপর বেদান্ত মতের প্রভাব।

বেদান্তের অর্থ ও হিন্দু জীবনে বেদান্তের প্রভাব।

বেদান্ত-মতই ভারতের প্রাচীনতম ও উচ্চতম দর্শন। আচার্য্য মোক্ষমূলর তাঁহার 'ভারতীয় ষড়দর্শনেতিহাসের' ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'বেদান্তদর্শন মনুষ্য চিন্তাশক্তির পরাকাষ্ঠা—"A system in which human speculation seems to me to have reached its very acme," বেদান্ত-নাম দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে বেদের সার নিষ্কৃষ্ট হইয়া বেদান্ত মত গঠিত হইয়াছে। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের অন্তভাগ বলিয়া, উপনিষদ্-নিবদ্ধ জ্ঞানই প্রধানতঃ বেদান্ত নামে অভিহিত। উপনিষদের জ্ঞান ব্যাসের 'উত্তর মীমাংসায়' প্রণালীবদ্ধ হইয়া 'বেদান্ত দর্শন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুর কার্য্য-জীবন যেমন বেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, হিন্দুর প্রকৃতি তদ্রূপ বেদান্তমতে গঠিত। সুতরাং বৈদিক কাল হইতেই বেদান্তমত হিন্দুজীবনে অধিকৃত হইয়াছে। আবহমানকাল হইতেই সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বেদান্তমত মূল-বিস্তার করিয়াছে। হিন্দুর ভাষা ও হিন্দুর সাহিত্যে বেদান্তের অন্তঃস্রোত প্রবাহিত। বেদান্তের মূলতত্ত্ব, হিন্দু সাধারণের তুল্যরূপ সম্পত্তি।

"The fundamental ideas of the Vedanta have pervaded the whole of their literature, have leavened the whole of their language and formed to the present day, the common property of the people at large" The six systems of Indian Philsophy—Prof. Max Muller"

বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের আদিকারণ নিরূপণই বেদান্তের প্রধান প্রতিপাদনীয় বিষয়। প্রথম হইতেই বৈদিক ঋষিদিগের মনে, জগৎকারণ-জিজ্ঞাসা উদিত হইয়াছিল। বহু দেবস্তুতির স্বাতন্ত্র্যবাদ (Henotheism)

হইতে ক্রমে প্রজাপতিরূপে একেশ্বরবাদ (monotheism), ব্রাহ্মণরূপে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ বা একত্ববাদ আত্মন্ রূপে, নিজের সহিত ব্রহ্মের অভেদবাদ, ঋষিদিগের চিন্তাতে আবির্ভূত হইয়াছিল। শেষোক্ত ভাবদ্বয়ে বেদান্তের বীজ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ইহাদের মূল উদ্ধৃত হইল :—

"আনীৎ অবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাৎহ অন্যৎ ন পরঃ।" 'সেই একব্রহ্ম স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন শ্বাসের সহিত প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন—তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই বিদ্যমান ছিল না।'

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ একএব।"

"এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

'প্রথমে এক আত্মাই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল।' আত্মাই সমস্তের স্বরূপ, ইহা নিত্য, হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই আত্মা।'

পূর্ব্বোক্ত দুইটী তত্ত্বই বেদান্তের স্তম্ভস্বরূপ। বেদান্তের মতে আত্মার স্বরূপ এই—বিদ্যমানতা (সৎ), চৈতন্যময়তা (চিৎ) ও নির্ব্বিকারতা (আনন্দ)।

বেদান্ত সম্প্রদায় ও মত।

প্রাচীন উপনিষদের মতে জগৎ, ব্রহ্ম হইতে 'নামরূপ' প্রাপ্ত হইয়াছে। ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ।

উপনিষদ্।

ব্রহ্মই জগতের আদি কারণ, তাহাতেই জগৎ উপসংহৃত হয়। ইহাকে 'পরিণামবাদ' বলা হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যই প্রথম 'মায়াবাদের' প্রচার করেন। তাঁহার মতে এক অদ্বৈত ব্রহ্ম, মায়োপহিত হইয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়, মিথ্যা জগৎ-দৃশ্যের বিস্তার করেন। ইহাতে যেমন একদিকে মায়া বা অবিদ্যার কুহকে ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে প্রতীয়মান হন, সেরূপ, অন্যদিকে ব্রহ্মেরই স্বরূপ জীবাত্মাও, আপনাকে সৃষ্ট বলিয়া প্রবাহিত করে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জগতের ব্যবহারিক যথার্থতা অঙ্গীকৃত করিয়া সাধারণ সংস্কারের সহিত আপনার মায়াবাদের সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তদ্রূপ ব্রহ্মের ব্যবহারিক সগুণ ভাব, স্বীকার করিয়া সাধারণ ক্রিয়া কাণ্ডের সহিতও স্বকার দর্শনের বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মতে দুর্ব্বল অধিকারীরা এই ব্যবহারিক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই পরব্রহ্ম জ্ঞানে উন্নতি লাভ করিতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতকে অদ্বৈতবাদ বলে। ইহার আর অপর নাম 'বিবর্ত্তবাদ'ও দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি এক ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, জগৎ ও ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) তাঁহার মতে মায়া মাত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা তাঁহার মতে স্বীকার্য্য। তাঁহার মত সংক্ষেপে এই কয়েকটী কথায় ব্যক্ত হইতে পারে—

'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'

রামানুজ।

রামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হইলেও, জগৎ মিথ্যা নহে। তিনি জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া কল্পনা করিয়া পরিণামে পরমাত্মার সহিত ইহার মিলন স্বীকার করেন। ইহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে।

মধ্বাচার্য্য।

মধ্বাচার্য্যের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত। পরমাত্মা ও জীবাত্মাতে

সেবা সেবক ভাব। ইহার মতকে দ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে।

বল্লভ।

বল্লভের মতে জীবাত্মা পরমাত্মারই রূপান্তর। ইহার মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

ডাক্তার Deussenএর মতে শেষোক্ত মতত্রয়, জগতের যাথার্থ্য পক্ষে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদেরই তাৎপর্য্য প্রকাশের বিফল চেষ্টা মাত্র। দূরদর্শী শঙ্করাচায্য এই সকল মতের উদ্ভব পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া, ইহাদিগের খণ্ডন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন যে, জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিলে ও জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের বিভাজ্যতা উপপাদিত হইয়া দেশকালাতীত অসীম ব্রহ্ম সসীম হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা রামানুজমত খণ্ডিত হইয়াছে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তুও নহে, কারণ ব্রহ্ম অনুভব-গ্রাহ্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ইহা দ্বারা মধ্বমত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। জগৎ ব্রহ্মের রূপান্তর ইহাও সম্ভবপর নহে, কারণ, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার (অবিকার্য্য)। ইহা দ্বারা বল্লভ-মত প্রত্যুক্ত হইয়াছে।

সুতরাং শঙ্করের 'মায়াবাদ'ই প্রকৃত বেদান্ত মত। মধুসূদন সরস্বতী তৎ প্রণীত 'প্রস্থান-ভেদে' বেদান্তকে সকল দর্শনের মুখ্যতম ও সকল দর্শনেরই অবলম্বন বলিয়াছেন, এবং শঙ্কর কৃত ব্যাখ্যাকেই বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তদীয় উক্তির ইংরেজী অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল—

'This the Vedanta, is the principal of all doctrines, any other doctrine is but a complement of it, and therefore, it alone is to be reverenced by all who wish for liberation, and this according to the interpretation of the venerable Sankar—this is the secret Max Muller's Six systems of Indian Philosophy pages 104—105

বেদান্ত ও সাংখ্য।

ষড়দর্শনের মধ্যে, বেদান্তের সহিত সাংখ্যেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাংখ্যের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ বেদান্তে দেখা যায়, বেদান্তের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগও সাংখ্যে দেখা যায়, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সাংখ্য দর্শনের 'প্রকৃতি' অর্থে 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং বেদান্তের 'ব্রহ্ম' অর্থে পুরুষ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। গীতাতে বেদান্ত ও সাংখ্য মতের সংমিশ্রণ হইয়াছে, ইহাতে উভয়েরই মূলতত্ত্ব এক সাধারণ দার্শনিক ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সাংখ্যের পুরুষ বেদান্তের ব্রহ্মের স্থানীয়। ব্রহ্ম হইতে পুরুষের প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম এক, পুরুষ বহু, ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্ববীজ লীন, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম মায়োপহিত হইলে সৃষ্টি হয়, পুরুষ প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইলে সংসার আরম্ভ হয়। মায়োপহিত পরমাত্মার নামান্তর জীবাত্মা, প্রকৃতি-সংশ্রিত পুরুষেরই অনুরূপ। মায়া বিদূরিত হইলেই সৃষ্টির বিনাশ ও ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদ হইলেই, সংসারনিবৃত্তি হইয়া পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধমত।

বেদান্ত ও সাংখ্যের সহিতও আবার বৌদ্ধ দর্শনের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সাংখ্যকে কেহ কেহ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের প্রসূতি বলিতেও কুণ্ঠিত

হয় না। কপিল ও বুদ্ধ'ক, কেহ কেহ, অভিন্ন জ্ঞানও করিয়া থাকেন। ইহাই উভয়ের সাদৃশ্যের দৃঢ়তর প্রমাণ। বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শনে সংসার ও পুনর্জ্জন্ম (বা সৃষ্টি) তত্ত্ব একই রূপ। কর্ম্মের জন্যই জীব পুনঃ পুনঃ সংসার-চক্রে আবর্ত্তিত হয়। সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের পার্থক্য লক্ষিত হয়। বেদান্ত মতে নির্গুণ ব্রহ্ম, সাংখ্য মতে সৎ বা সত্ত্বামাত্রোপলক্ষিত পুরুষ, সৃষ্টির মূলাধার কিন্তু বৌদ্ধমতে অসৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভ। ইহাতেই বৌদ্ধ মতকে শূন্যবাদ বলা হইয়া থাকে। বেদান্তের মায়াবাদের অযথা ব্যবহারেই এই বৌদ্ধ শূন্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কোন কোন বৈদান্তিকও পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদাবলম্বী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নামে বিশেষিত হয়। এই 'শূন্যবাদের' মতে আমাদের অনুভূতিজ্ঞান ব্যতীত আর সমস্তই অলীক ও অসার। সুতরাং ইহার নামান্তর 'বিজ্ঞামাত্র' বা 'জ্ঞানমাত্র'। শঙ্কর ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, কোন সত্য বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সমস্ত অনিত্যের মূলে এক নিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করা আবশ্যক।

বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, বেদান্তের ভূমানন্দ ও সাংখ্যের কৈবল্য, সংসারের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির একই চিত্র।

ইউরোপের সহিত ভারতের সংস্রব।

গ্রীসের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, গ্রীক্ জাতি স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই Ionian নামে তাঁহাদের এক শাখা এসিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই এসিয়া মাইনরে গ্রীকগণ বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। গ্রীক্ আদি কবি Homer, প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক Herodotus ও গ্রীক্ দর্শনের জন্মদাতা Thales এই Ionic গ্রীক্‌দিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। Ionic গ্রীক্‌দিগের মধ্যেই গ্রীক্‌দর্শন প্রথম উদ্ভূত হয়। ইহা হইতেই ইঁহাদের নাম Ionic দার্শনিক সম্প্রদায় হয়। Ionic গ্রীক্‌গণ প্রাচীনকাল হইতেই পারসীক্‌দিগের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রবে আসে, এবং সেই সূত্রে ভারতের সহিতও তাহাদিগের সংস্রব অসম্ভাবিত নহে। ভারতের সহিত বাণিজ্য ও সৈনিক কার্য্যের জন্য অতি পুরাকাল হইতেই পরস্পরের সম্বন্ধ প্রমাণিত হইয়াছে।

আচার্য্য Goldstucker প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৈয়াকরণাচার্য্য পাণিনি, বৈদিক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে 'যবনানী' পদ যবনদিগের লিপি অর্থে লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈদিক কালেই Ionianএরা ভারতে যবন নামে পরিচিত হন। কারণ Ionian এই শব্দের সহিত 'যবন' নামের যেরূপ সাদৃশ্য, সেরূপ অন্য কোন শব্দের সহিতই নহে।

পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতে মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম প্রচারের চিহ্ন পাওয়া যায়। তুরস্কদেশীয় বসোরা নগরে গোবিন্দ রায় ও কল্যাণ র'য় নামক দুই বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ Alexandria পর্য্যন্ত যে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের Alasando নাম হইতেই প্রমাণিত হয়।

বাণিজ্যব্যপদেশেও ভারতের বৈদেশিক

সংশ্রবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের গজদন্ত পণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল। গজের ভারতীয় ইভ নাম হইতে গজদন্তের নাম ivory হইয়াছে।

Solomonএর সময় হইতেই ভারতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ থাকার বিষয় old Testamentএ উল্লেখ দেখা যায়। তথায় ভারত Ophir বা স্বর্ণদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ইহাতে বোধ হয় ভারতের সমৃদ্ধির প্রবাদ প্রাচীনতম কাল হইতেই পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জ্ঞান-গৌরবও অপ্রকাশিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রথিত আছে, গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরস্ জ্ঞানসংগ্রহের জন্ত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং ভারত হইতে পুনর্জ্জন্মমত ও দশকসংখ্যা স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

"Some of the most ancient of the Greek philosophers travelled into India, that by conversing with the sages of that country, they might acquire some portion of the knowledge for which they were distinguished" Robert's Hist Disqu-Con. Anc. India p 240.

মহাবীর আলেক্জাণ্ডার ভারতের জ্ঞান ও ধন, এই উভয় সমৃদ্ধির কথা জানিয়াই বোধ হয় ভারতাক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আচার্য্য মোক্ষমূলর তাঁহার ভারতীয় ষড়দর্শনের ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রীক্ মহাপণ্ডিত Aristotleএর পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় দর্শনের অস্পষ্ট কিম্বদন্তী পাশ্চাত্য সমাজে প্রচারিত ছিল। কথিত আছে, আলেক্জাণ্ডারের নিজের মনে এই ধারণা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। তিনি যে, ভারতীয় যোগীদিগের সহিত আলাপ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারাই উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয়। স্বনামখ্যাত কল্যাণ এই যোগীদিগের অন্যতম বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি মেসিডনীয় সৈন্যের সমক্ষে জ্বলন্ত-চিতারোহণে স্বেচ্ছাতে মৃত্যু আলিঙ্গন করেন।

"There had been vague traditions of ancient Indian philosophy, even, before the time of Aristotle. Alexander himself, we are told, was deeply impressed with that idea, as we may gather from his desire to communicate with the gymnosophists of India. One of these gymnosophists or Digambaras seems to have been the famous Kalanos (Kalyana ?) who died a voluntary death by allowing himself to be before the eyes of the Macedonian army

পূর্ব্বোক্ত পাইথাগোরসের ভ্রমণ বৃত্তান্তও, আচার্য্যমোক্ষমূলর-বর্ণিত কিম্বদন্তীর সমর্থন করে।

এরূপও কিম্বদন্তী আছে যে, Sarmancherja (সম্ভবতঃ শর্ম্মণাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রীস্‌দেশে গমন করিয়া ম্লেচ্ছদেশে আগমনহেতু আপনাকে পতিত জ্ঞান করিয়া, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এথেন্স নগরে অগ্নিপ্রবেশ করেন।

গ্রীকদিগকে, পুরাকাল হইতেই, ভারতের সম্বন্ধে কৌতুকপরায়ণ দেখা যায়। ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রীক্‌দিগকে ভারতের সংশ্রবে আসিতে উৎসুক করে। ভারতীয় দর্শনই গ্রীক্‌দিগের অধিক বিস্ময়ের কারণ হয়। এই জন্যই মহাত্মা আলেক্জাণ্ডার ভারতে আসিয়া যোগীদিগের বিষয় জানিবার জন্যই প্রথম কৌতূহল প্রকাশ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি ভারতীয় দর্শন গ্রন্থ সকল স্বগুরু Aristotle সমীপে প্রেরণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ-

সভাস্থ গ্রীকদূত Megasthenesও, তাঁহার ভারত-বিবরণে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি দর্শনে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রীক দর্শন ভারতীয় দর্শনের সমকক্ষ হইলে কখনও গ্রীকগণ ভারতীয় দর্শনের প্রতি এরূপ সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতেন না।

গ্রীক্‌দিগের ভারতাক্রমণ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা। গ্রীক্‌দিগের লিখিত বিবরণেই এই সময়ের প্রমাণিত বিবরণ পাওয়া যায়। সিংহলের পালিভাষা-বিরচিত 'মিলিন্দা প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে গ্রীক্ শাসনকর্ত্তা মীনেন্দ্র (Menander) বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক নাগসেন হইতে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হন বলিয়া লিখিত আছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে ভারতীয়ধর্ম্মপ্রচারকগণ Alexandria-তে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করেন। বৌদ্ধ দর্শনের সহিত বেদান্ত দর্শনের সাদৃশ্য পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে বেদান্তমতও পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ইহা সহজেই অনুমেয়।

পাইথাগোরসের ভারত ভ্রমণ ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক্ দার্শনিক-প্রবর প্লেটোর জীবন আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি জ্ঞান-পিপাসু হইয়া মিশর (Egypt) পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বেই Egyptয়ে ভারতীয় জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়ের মতও, প্লেটোর দর্শনকে বিশেষ গঠন প্রদান করে। পাইথাগোরস তাঁহার দার্শনিক মতের জন্য ভারতের নিকট ঋণী ছিলেন। পাইথাগোরসের মত-যোগেই হউক বা মিশরে অনুশীলিত জ্ঞান যোগেই হউক, প্লেটোর দর্শন, হিন্দুদর্শনের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভে NeoPlatonic সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। ইতিহাসের প্রমাণে আলেকজেণ্ড্রিয়ার সহিত ভারতের সম্বন্ধ তখন ঘনিষ্টতর বলিয়া জানা যায়। এই NeoPlatonic দর্শনেই বেদান্তমতের প্রভাব প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত 'যবন' নাম এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের প্রমাণ দ্বারা NeoPlatonic মতের পূর্ব্বেও, গ্রীক্‌দর্শনের বেদান্ত মতের সাদৃশ্য ভারতীয় সংশ্রব-মূলক বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য হইলাম।

অধ্যাপক Weber, Wilson, Colebrooke, Count Goblet d' Alviella ও Gires প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে গ্রীক্ দর্শন ভারতীয় দর্শনেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছে। Count Goblet d' Aevi-ella তাঁহার Ce que l' Inde doit a'la Grice নামক গ্রন্থে Alexanderএর ভারতাক্রামণের পর হইতে যে গ্রীক্ ও ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সযত্নে বহুতর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তদীয় গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, Damascusএর বর্ণনায় জানা যায় যে, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় ব্রাহ্মণ-প্রবাসী বর্ত্তমান ছিল। Max Muller ও Niebuler উভয়েই গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের সাদৃশ্য, এবং গ্রীক্ ও হিন্দুর সংশ্রবও স্বীকার করেন। Max Mullerএর মতে "গ্রীক্ ও হিন্দুর মানসিক প্রকৃতির সমতাই এই সাম্যের কারণ। গ্রীক্ ও হিন্দুর সংশ্রবের এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে পরিষ্কার ভাবে উভয়ের ভাব বিনিময় হইতে পারে।" ইহার প্রত্যু-

ত্তরে আমরা এই বলিব যে, প্রকৃতি সাম্য কারণ হইলে, ইউরোপীয় অন্যান্য আর্য্য শাখারও স্বাধীন ভাবে এইরূপ দার্শনিক বিকাশ সম্ভবপর হইত। গ্রীকগণ স্বয়ং ভারতীয় জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিয়া যে তাঁহারা ভারতীয় দর্শনের মূলসূত্র অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে কি অসম্ভাব্য আছে? Niebuler উভয় দেশীয় দর্শনের সাদৃশ্য ও উভয় জাতির সংস্রব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও, ভারতীয় দর্শনকেই গ্রীক্ দর্শনের অনুবর্ত্তনকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহাতে যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয়, তাহা বোধ হয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। গ্রীক্‌দিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বেই ভারতীয় দর্শন মত সকলের উৎপত্তি ও শৃঙ্খলাবন্ধন সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎদিগের অতি অল্প মত-বৈষম্যই দেখা যায়। আচার্য্য মোক্ষমূলর-রচিত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভারতীয় ষড়দর্শনেতিহাসের একটী মাত্র সূত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা ভারতীয় দার্শনিকদিগের মৌলিকতা ও Niebuler অবলম্বিত মতের অসারতা প্রতিপাদন করিব :—

"The conception of the world as deduced from the Veda, and chiefly from the Upanishads, is indeed astounding. It could hardly have been arrived at by a sudden intention or inspiration, but presupposes a long preparation of metaphysical thought, undisturbed by any foreign influences." Preface.

প্রাচ্যভাষাবিৎ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Wilson-এর মতও ইহারই পরিপোষক :—

"That the Hindus derived any of their philosophical ideas from the Greeks, seems very improbable, and if there is any borrowing in the case, the latter were most probably indebted to the former."

মহাপণ্ডিত Colebrooke-এর মত আরও স্পষ্টরূপে ভারতের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়, যথা—"The Indians were in this instance, teachers, rather than learners" এস্থলে ভারতবর্ষীয়েরা শিক্ষার্থী না হইয়া বরঞ্চ শিক্ষক ছিলেন।

এতৎসঙ্গে আমাদের স্বদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের মতও উল্লেখযোগ্য—

"Modern researches by Western scholars and savants distinctly point out that the mythologies, philosophies, creeds and customs of ancient Greece, Italy and Egypt were of Asiatic, especially of Indian origin." Boses Hindu civilization in ancient America, Page.

গ্রীকগণই ইউরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান-গুরু, সুতরাং গ্রীকদর্শনের তুলনায়ই আমরা ইউরোপে বেদান্তমতের প্রভাবানুসরণে প্রবৃত্ত হইব। জগৎ রহস্য-প্রকাশের চেষ্টা হইতে প্রথম দার্শনিক জিজ্ঞাসা আরব্ধ হয়।

Ionic সম্প্রদায়।

গ্রীকদিগের Ionian শাখাসম্ভূত Thalesই প্রথম গ্রীকদিগের মধ্যে দর্শনের প্রবর্ত্তক। তাঁহার সম্প্রদায় Ionic দার্শনিক সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায় পঞ্চভূতের একতমকে জগতের মূলতত্ত্ব ধরিয়া জগৎ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন, ইঁহাদিগের জড়বাদ হিন্দুদিগের পাঞ্চভৌমিক সৃষ্টির সহিত তুলনীয়।

পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়।

Ionic সম্প্রদায়ের পর পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়। ইহারা Ionicদিগের জড়বাদে সন্তুষ্ট না হইয়া জগতের আরও গূঢ়কারণ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। দেশকালাবচ্ছিন্ন

হইয়াই পদার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব সংখ্যা ও বিস্তৃতি তাঁহাদের মতে পদার্থজ্ঞানের প্রকৃত মানদণ্ড। বিস্তৃতি বা পরিমাণ সংখ্যারই সমষ্টি বলিয়া, সংক্ষেপে সংখ্যাকেই ইঁহারা পদার্থের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে সংখ্যাই সংযোগ-সাধক। এই সংখ্যা-বাদ জড়জ্ঞানমূলক হইলেও ইহার বিশ্লেষণশক্তি জড়বাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহাতে মায়াবাদের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে দেহ আত্মার কারাগার স্বরূপ, উর্দ্ধলোকই আত্মার প্রকৃত দেশ। আত্মা পরমেশ্বরেরই অধিকার, পরমেশ্বরের স্বারূপ্যলাভই আত্মার কর্ত্তব্য। ইহা মধ্বমতের সহিত অনেকাংশে তুলনীয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মধ্বাচার্য্য পাইথাগোরস অপেক্ষা নব্য হইলেও, তাঁহার মত তেমন নব্য নাও হইতে পারে, কারণ আচার্য্য মোক্ষমূলরের মতে ভারতভূমিতে দর্শনবীজ সকল দূরতম অতীত কালেই উপ্ত হইয়াছিল।

Eleatics

পাইথাগোরীয়দিগের পর ইলিয়েটিক্স সম্প্রদায়। ইঁহারা জড়ের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ দ্বারা পাইথাগোরীয়দিগের দেশকালসম্বন্ধের অতীত নিত্য সত্তা বা সদ্বস্তু-তত্ত্ব(Pure being) স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের "one and all, সকলই এক, বেদান্তের "তদেকম" তত্ত্বেরই অনুবাদ মাত্র। ইঁহাদিগের Pure beingএ বেদান্তমতের ব্রহ্মতত্ত্বের বা সাংখ্যের পুরুষ তত্ত্বের প্রথম অঙ্কুর দেখা যায়; জড়জগতের অসারতা প্রতিপাদনে 'মায়াবাদের' প্রথম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

Eleatics সম্প্রদায়ের মতবাদে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" 'হেসোম্য (শান্ত) প্রথমে এক সৎমাত্রই বর্ত্তমান ছিল', এই আর্যজ্ঞানের অনুবৃত্তি দেখিতে পাই। Eleatics সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা Parmenides-এর মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা আমরা তাঁহাদের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব। তিনি সৎকে, মূলতত্ত্ব রূপে পর্য্যাপ্ত মনে না করিয়া,তাহাতে চৈতন্যের আরোপ করেন। এইরূপে বেদান্তের 'সচ্চিৎ' ভাবের উপলব্ধি Eleatics সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হয়। দৃশ্যমান জগৎকে ভ্রম বলিয়া প্রকাশ করিয়া তিনি স্পষ্টরূপে মায়াবাদের প্রচার করেন। Dr Deussenএর মতে Parmenidesই Platoর মায়াবাদের পথ-প্রদর্শক।

Heraclitus

কিন্তু জড়জগৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সুতরাং Heraclitus নিত্যসত্তার সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ উপপাদিত করিবার জন্য অব্যক্তনিত্য সত্তার (Pure being) ব্যক্তাবস্থায় (becoming) উভয়ের অভিন্নতা স্বীকার করেন। তাঁহার মতে জগৎ অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, অব্যক্তনিত্যসত্তার শক্তিতে জগৎ বিপবিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাতে বেদান্ত ও সাংখ্যের মায়া ও প্রকৃতি সহকারিতায় জগৎ প্রবর্ত্তনমত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

পরমাণুবাদ।

অতঃপর পরমাণুবাদ আবির্ভূত হয়।

Anaxagoras.

Anaxagoras অন্ধ জড়শক্তি দ্বারা জগৎ ব্যাখ্যার অপূর্ণতা অনুভব করিয়া, জড়ের পার্শ্বে সৃষ্টি-সঙ্কল্প সমর্থমনের কল্পনা করেন। ইহা দ্বারা দর্শন শাস্ত্রের একটী মহৎ সত্য উদ্ধার হইল। দর্শনশাস্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী

জড়বাদের স্থান এখন জ্ঞানবাদের (ideal principle) উদ্ভব হইল।

Sophists

ইহার পর সোফিষ্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। পূর্ব্বে যে জ্ঞানবাদেব উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার দ্বারা অন্তর্জ্ঞানের প্রতিই অধিক অধিনিবেশ হইল, বাহ্যজ্ঞান অবজ্ঞাত হইতে লাগিল। মনুষ্যই সকলের পরিমাপক (man is the measure of all things) ইহাই ইহাদিগের সার-কথা। ইহা "অহ-ঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" 'অহ-ঙ্কার-বিমুগ্ধ (বিভ্রান্ত) আত্মা আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে' এই গীতাবাক্যেরই মর্ম্ম প্রকাশ করে। এই অহংজ্ঞানের অতি প্রাধান্যবশতঃ প্রত্যক্ষই মাত্র বস্তুজ্ঞানেব প্রমাণ হইল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান ব্যতীত বস্তুজ্ঞানের সাধারণ ভূমি অস্বীকৃত হইল।

Socrates.

এই ব্যক্তিগত অহঙ্কার-জ্ঞান ও বস্তু-জ্ঞানের সাধারণ ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই সক্রেতিসের দর্শন জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেকের অহঙ্কার-জ্ঞানেরই মূলে এই অনু-ভূতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার জ্ঞান কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান নহে, ইহা ব্যক্তি-মাত্রেরই পক্ষে তুল্যজ্ঞান, এইরূপে প্রতি-জ্ঞানের বাহ্য প্রমাণ ও বাহ্য সম্বন্ধ বিচার করিয়া চিন্তার সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের দ্বারা Socrates অহংজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার মতে বিচার শক্তিই প্রকৃত তত্ত্ব, কিন্তু ইহার সার্ব্বভৌমিক প্রকৃ-তির দ্বারা তাঁহার দর্শন বাহ্য বিষয়ক বা জ্ঞেয়-প্রধান হইয়াছে।

প্রত্যেক বস্তুরই ব্যক্তিগত বিশেষজ্ঞানের সামান্য লক্ষণ দৃষ্টে বস্তু সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানের (generalised idea) সিদ্ধান্ত করিয়া সক্রে-তিস্ বস্তু মাত্রেরই মূল প্রকৃতি অবধারণ করেন। প্রোক্ত উভয় তত্ত্বই মনুষ্যের অন্তঃ প্রকৃতির উপাদান প্রদান করিয়াছে। অত-এব মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণই প্রকৃত তত্ত্ব লাভের উপায় স্বরূপ। এইজন্যই সক্রে-তিস্ 'know thyself' 'আত্মতত্ত্ব অবগত হও' এই বাক্যটীকেই তদীয় দর্শনের মূল ভিত্তি করিয়াছেন। সক্রেতিসের এই একটী উক্তিতেই দর্শনের প্রকৃত প্রতিপাদ্য স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রীক্‌দর্শনের জড়-বাদ ও জ্ঞান-বাদের প্রকৃত সামঞ্জস্য এই একটী বাক্যেই অতি আশ্চর্য্যরূপে বিহিত হইয়াছে। গ্রীক্ চিন্তা প্রণালী সক্রেতিস দর্শনেই শৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইয়াছে। সক্রেতিস্‌ই প্রকৃত পক্ষে গ্রীক্ দর্শনের জন্মদাতা। এইজন্যই এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, সক্রেতিস্ 'তত্ত্বজ্ঞান' স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উক্তিতে আমরা 'আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই ঋষি বাক্যেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। সক্রেতিস্ দর্শনের ইহাই তাৎপর্য্য যে, সমস্ত অহংজ্ঞানের মূলভিত্তি আত্মজ্ঞান, সমস্ত বস্তু জ্ঞানেব মূল ভিত্তি সামান্য জ্ঞান।

Plato.

সক্রেতিস্ সামান্য জ্ঞান-(generalized notion)-কেই বস্তু সকলের প্রকৃত তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তৎশিষ্য প্লেটো বস্তু হইতে এই সামান্য জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার 'মায়াবাদ' রচিত করিয়াছেন। সক্রেতিস্ যাহাকে জ্ঞাতার মানসিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন—Plato তাহাতে পৃথক্ অস্তিত্ব আরোপ করিয়া তাহার পৃথক্ স্বরূপ প্রচার করেন। প্লেটোর মতে আত্মা-

দের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমস্তেরই একটী একটী আদর্শ (archetype) রহিয়াছে। যাহা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা ঐ আদর্শেরই ছায়ামাত্র—ঐ আদর্শই প্রকৃত স্বরূপ। সুতরাং আমাদের জগৎজ্ঞান অলীক, ঐ আদর্শ-জ্ঞানই জগতের প্রকৃত সত্য। জগতের চির পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঐ আদর্শ-জ্ঞানই নিত্য-পদার্থ। প্লেটোর দৃশ্য জগতে জ্ঞান-স্বরূপ বা আদর্শের (ideas or archetypes) প্রতিভাস, বেদান্তের জীবাত্মারই প্রতিরূপ। প্রতিভাসের অন্তরালে আদর্শজ্ঞান, বা পরমাত্মা প্রকাশক রূপে বিরাজমান। Dr. Deussen তাঁহার 'Philosophy of the Vedanta' নামক পুস্তিকায় এইরূপে বেদান্ত ও প্লেটোর মায়াবাদের তুলনা করিয়াছেন :—"You see the concordance of Indian, Grecian and German metaphysics, the world is maya, is illusion, says Cankara, it is a world of shadows, not of realities, says Plato; it is appearance only, not the thing in itself, says Kant."

Aristotle.

প্লেটোর আদর্শ জ্ঞান বিশেষ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ব্যাখ্যাত হয় নাই। Aristotle গুরুর এই অপূর্ণতা দূর করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আদর্শের বিশেষ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই, প্রত্যেক বিশেষ-জ্ঞানেই আদর্শ অনুস্যূত। প্রত্যেক বিশেষ জ্ঞানেই আদর্শ উপলব্ধ। প্লেটোর জ্ঞানের বিচার দ্বারা এরিষ্টটল্ জ্ঞেয়ের বাহ্য রূপ ও স্বরূপ, এই দুইটী লক্ষণে উপনীত হন। বস্তুর কারণাবস্থারই নাম স্বরূপ, ও কার্য্যাবস্থার নাম বাহ্যরূপ। কারণের কার্য্যোন্মুখ শক্তি (potentia) দ্বারাই কার্য্যোৎপত্তি হয়। বেদান্ত ও সাংখ্যের কার্য্যকারণের অভেদবাদের সহিত এরিষ্টটল্-মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হয়। কারণের প্রকট অবস্থারই নাম কার্য্য, আর কার্য্যের অপ্রকট অবস্থারই নাম কারণ। এই কার্য্য-কারণের একাত্মতা প্লেটোর দ্বৈতবাদের স্থান গ্রহণ করে।

Stoicism &c.

Stoicism, Epicureanism, Scepticism ও NeoPlatonism, এই চারি সম্প্রদায় Aristotleএর পরবর্ত্তী। ইঁহাদের দার্শনিক মতে জ্ঞাতৃত্বের (subjectivity) প্রাধান্য লক্ষিত হয়। Stoicদিগের মতে জ্ঞাতার সার্ব্বভৌমিকত্ব (universality of subjectivity) স্বীকার্য্য। জ্ঞানযোগই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন। সমপ্রকৃতি, সমপ্রকৃতির উপর কার্য্য করে, বিরুদ্ধ প্রকৃতির পরস্পরের উপর কার্য্য করা অসম্ভব, এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া, ইঁহারা পদার্থ জ্ঞানের সাম্য স্থাপন করিবার জন্য, Aristotleএর জগৎ ও ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক মতের প্রতিবাদ করেন। ব্রহ্মকে স্বরূপ ও জগৎকে রূপ বলিয়া কল্পনা করায়, তাঁহাদের মতে বিরুদ্ধ প্রকৃতির আপেক্ষিক কার্য্যরূপ দোষ, Aristotle দর্শনকে স্পর্শ করিয়াছে। অতএব তাঁহারা জগৎ ও ব্রহ্ম এক বস্তু, এই মত প্রকাশ করেন। ইহার নিষ্ক্রিয় অনিত্য ভাবজগৎ ও নিত্য স্বরূপ, সক্রিয়ভাব ব্রহ্ম। জগৎ দেহ ও ব্রহ্মই আত্মা। 'এতদাত্মমিদং সর্ব্বং' এই বেদান্ত মতেরই মর্ম্ম ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে।

Epicureanism প্রবৃত্তিমার্গে আত্মতৃপ্তি সাধনই পুরুষার্থ মনে করে।

Scepticism তদ্বিপরীত নিবৃত্তিমার্গে আত্মচরিতার্থতাই পুরুষার্থ জ্ঞান করে। বৈরাগ্যই ইহার প্রধান উপায়।

NeoPlatonism—জ্ঞাতা বা জীবাত্মার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা পরমাত্মার সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি, ইহাই NeoPlatonismএর বিশেষ লক্ষণ। ধ্যান যোগের দ্বারাই মাত্র এই বিলয় সংঘটিত হইতে পারে। (mystical absorption into divinity or the one)। নিউপ্লেটনিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী Plotinusএর মতে এক বা অদ্বিতীয় (one),'নেতি''নেতি' দ্বারাও নির্দ্দেশ্য নয়, ইহা অবাঙ্মনসগোচর (all other negative determinations are incompetent in its regard; in short it is something unspeakable and unthinkable) ইহা "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্যং মনসাসহ" এই বেদান্ত বাক্যেরই অবিকল অনুবাদ। এই পরমাত্মার বিপরিণাম এইরূপ কল্পিত হইয়াছে:— নিত্যশুদ্ধ (the all perfect and eternal) প্রথমে আপনা হইতে চিতের (reason) বিকাশ করিলেন, চিৎ হইতে ভূতাত্মা (ঈশ্বর) (eternal soul of the world) বিকাশ করিলেন। ভূতাত্মা হইতে জীবাত্মা বা প্রত্যাত্মা (individual soul) বিকাশ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিতত্ব বেদান্তের সৃষ্টিতত্বেরই অনুবর্ত্তন।

NeoPlatonic দর্শনে একত্বেরই প্রতিষ্ঠা, প্রাচীন দর্শন ইহাতে চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। Dr Deussen লিখিয়াছেন—

'The conclusion is that Jiva, being neither a part nor a different thing, nor a variation of Brahman, must be the Parmatman fully and totally himself, a conclusion made equally by the Vedantin Cankara, by Platonic Plotinus and by the Kantean Schopenhaur' কিন্তু প্রাচীন দর্শনের অন্তিম দশাও এই দর্শনেই উপস্থিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্মবিজ্ঞান।

খ্রীষ্টধর্ম্ম NeoPlatonic সমস্যারই সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ব্যবধান তিরোহিত হইয়া, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার বস্তুগত একত্ব (substantial unity of God and man) প্রচারিত হইল। পরমেশ্বর মানব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই খ্রীষ্ট দর্শনের মূলতত্ব। 'God made man after his own image'—খ্রীষ্টীয় এই সারবাক্য 'তত্বমসি' এই বেদান্ত বাক্যকেই প্রমাণিত করিতেছে।

Scholasticism.

পরবর্ত্তী Scholasticismএ যুক্তি ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধানই প্রধান লক্ষ্য। বস্তু ও চিন্তার অভেদ জ্ঞানকে স্বীকার্য্য করিয়াই Scholasticism প্রবর্ত্তিত। ইহার শেষ ফলে, বস্তুর বাহ্য অস্তিত্বের ধ্বংস হইয়া, কেবল চিন্তার আকরেই বস্তুর বিদ্যমানতা রহিল। সুতরাং একমাত্র চিন্তাই এখন জ্ঞানের বিষয় হইল। বহির্জ্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, চিন্তা কেবল কূট তর্কজালেরই সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হইল। একদিকে

পরিবর্ত্তন যুগ।

যেমন বাহ্য বস্তুর প্রতি আস্থা বর্দ্ধিত হইল, অন্যদিকে তদ্রূপ আত্ম স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব-বোধও (independent self-conciousness) জাগরিত হইল। এতদুভয়ের প্রথমটী অবলম্বনে Bacon বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূলপত্তন করিয়াছেন, দ্বিতীয়টী অবলম্বনে Descrates বর্ত্তমান দর্শনের মূলপত্তন করিয়াছেন।

নবযুগ।

Baconএর সহকারীদিগের মধ্যে Vanini ও Giordano Brunoই প্রকৃতির প্রতি

আস্থা ন্যূনাধিক মাত্রায় বেদান্ত মতেরই লক্ষণাক্রান্ত (their enthusiasm for nature, an enthusiasm, which, with all of them, has more or less of a pantheistic character)

Vanini

Vanini তাঁহার কোনও প্রবন্ধের নামকরণ এইরূপ করিয়াছেন—'of the wonderful secrets of the queen and Goddess of mortals Nature' 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী ও পরমেশ্বরী প্রকৃতি দেবীর আশ্চর্য্য রহস্য বিষয়ক (গ্রন্থ)। ইহাতে আমরা সাংখ্য প্রকৃতির বর্ণনা পাইতেছি।

Bruno.

Brunoর মতে এক পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবী চৈতন্য বিশিষ্টা। এই পরমাত্মা জগতের রূপ সকলের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেন (Reveals himself in the space of the world) ইহাতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অনুসৃত হইয়াছে।

J Bohm.

জর্ম্মেনিতে Jacob Bohmই নব পরিবর্ত্তন যুগের নায়ক। তাঁহার মতে স্বগতভেদই আত্মার স্বভাব, পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরও ইহাই স্বভাব, ইহাতেই আত্মানুভব জন্মে। এই আত্মানুভবে জ্ঞেয় রূপে বাহ্য সম্বন্ধ হইতেই আত্মার বাহ্য অভিব্যক্তি রূপ সংসার হইয়া থাকে (self-externalization of God into a world) শঙ্করের মায়োপহিত ব্রহ্মের স্রষ্টা ও সৃষ্ট রূপে প্রতীয়মান হওয়ার তত্ত্ব এইখানে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দার্শনিক বিকাশে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, ইহাকে Spinozaর দার্শনিক প্রণালীরই অগ্রপূরক বলিতে নয়। Spinoza যেস্থলে, প্রত্যেক সসীমের একনিত্যে প্রত্যাবর্ত্তন শিক্ষা দেন, Bohm সেস্থলে সসীমের অসীম হইতে বিবর্ত্তন শিক্ষা দেন। কারণ, এই আত্মাভিব্যক্তি (self-direction) ব্যতীত পরমাত্মার সত্তা অসত্তারই মত থাকিত।

Descartes.

Descartes জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় ও উপাদান নির্ণয় করিবার জন্য 'নসংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রানি পশ্যতি' এই ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস সকলকেই সংশয়ের অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। তাহাতে একটী মাত্র জ্ঞানই তাঁহার নিকট উজ্জ্বল স্বর্ণ রূপে প্রতিভাত হইল, তাহা চিন্তাপরায়ণ রূপে তাঁহার স্বকীয় বিদ্যমানতা। আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে (cogito, ergo sum) এই জ্ঞান সংশয়ের অতীত। নিজের অস্তিত্ব সংশয় করিতেও, সংশয়কারীর বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধরূপে অনুভূত হয়। সুতরাং cogito ergo sum ইহাই Descartesর দর্শনের মূলসূত্র। শঙ্করও একমাত্র আত্মজ্ঞানের প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন—

'My atman cannot be illusive as Cankara shows, anticipating, the 'cogito ergo sum' of Descartes, for he would deny it, even in denying it, witnesses its reality.' Philosophy of the Vedanta, Duessen *

'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ' এই বেদান্ত মতে আত্মই সর্ব্বজ্ঞানের বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানের আধার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। Descartesও আপনার চিন্তার বিষয় সকলের বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞানকেই প্রধান রূপে উপলব্ধ করিয়াছেন। ইহার কোন বাহ্য

* "অস্তিতাবৎ স্বয়ং নাম বিবাবাদাবিষয়ত্বতঃ।
স্বাস্মন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যো বাকোভবেৎ॥"
পঞ্চদশী তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মূল অনুমিত না হওয়ায় ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন।

'আমার চিন্তাদ্বারা আমার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেই,' Descartesর এই মূল সিদ্ধান্ত হইতে দুইটী জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে; একটী আমিরূপ বস্তু ও অপরটী আমার চিন্তারূপ মন। Descartes উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া সংযোগ সাধনার্থ ঈশ্বর-জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহার মতে দৈবসঙ্কেতে উভয়ের সংযোগ বিহিত হইয়াই, মনে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব বোধ জন্মে।

Geulinx

মন ও অগ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ নিরূপণই Descartesর পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের প্রধান সমস্যা হইয়াছে। Geulinxএর মতে চিৎ অচিতের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অসম্ভব। বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রায়ে তত্তৎ বস্তুর ভাব মনে উদ্বোধিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয়, Geulinxএর ব্যাখ্যা। ইহাকে উপলক্ষিক মত (occasionalism) বলা হইয়া থাকে।

Malebranche

Malebranche বলেন,বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ স্বীকার্য্য। পরমাত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু। ইহা চিৎ, অচিৎ, উভয়েরই আধার, উভয়েরই স্বরূপ ইহাতে উদ্ভাসিত। সুতরাং পরমাত্মার জ্ঞান-যোগেই মাত্র (through participation of His knowledge) আমরা বস্তুর স্বরূপ বোধে সমর্থ হই।

Spinoza.

Spinoza, Malebranche মতের বৈশদ্য সম্পাদন করিয়া, Descartes মতের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণসত্তা। জাগতিক পদার্থে যে সত্তা আরোপিত হয়, তাহা অনিত্য। সমস্ত জাগতিক পদার্থই এক সদ্বস্তুরই ক্ষণিক ব্যাপার মাত্র (accidents of the one true substance) Spinozaর মতে ব্রহ্ম ব্যতীত সৃষ্টির আর মূলাধার নাই। তাঁহার মতে এই একত্বে সমস্ত বহুত্বের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত। Spinoza বেদান্ত লয় তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। বেদান্তের "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব" Spinoza দর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম। Spinoza ইহুদি জাতীয়। জাতীয় সংস্কারের ফল স্বরূপ প্রাচ্য একত্ব তত্ত্ব তাঁহার দর্শনে প্রতিধ্বনিত (an echo of the east)

বাস্তব-বাদ ও জ্ঞান-বাদ।

(Realism and Idealism)

Spinoza একত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেও, দ্বিত্বের একবারে ধ্বংস করিতে পারেন নাই। চিৎ ও অচিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কেবল পরমাত্মাতে তাহাদিগকে এক সূত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়কে একে পরিণত করার চেষ্টা হইতে দুইটী পক্ষের উৎপত্তি হইল। একপক্ষ জড় হইতেই সমস্ত উৎপাদিত করিলেন; তাঁহাদের মতে চিত্ত বা মন জড়েরই সূক্ষ্ম বিকাশ মাত্র। অপর পক্ষ জ্ঞানমাত্রই চিত্তের অনুভূতি সাপেক্ষ বলিয়া, সমস্তকেই চিত্তেরই সৃষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিল। প্রথম পক্ষের নাম হইল Realism বা বাস্তববাদ, দ্বিতীয় পক্ষের নাম হইল Idealism বা জ্ঞান-বাদ।

Locke

ইংরেজ দার্শনিক Locke ও Humeই বাস্তব বাদে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। Locke-এর মতে মনের সহজাত সংস্কার বলিয়া

কোনও জ্ঞান নাই, সমস্তই বাহ্যজগতের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ। মানসিক পর্য্যালোচনা ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারাই আমাদের মানসিক প্রকৃতি গঠিত হয়।

Hume.

Hume, Lockeএর স্বীকার্য্য মনেরও অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া, পদার্থ সকলের বাহ্যসম্পর্কানুভবকে কেবল জ্ঞানের সাহচর্য্যমূলক (association of ideas) বলিয়াছেন। ইহাতে মন, অহংত্ব প্রভৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে গণ্য না হইয়া, জ্ঞানের পরম্পরা (succession of ideas) রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

Lockeএর অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) ও Humeএর সংশয়বাদ (Scepticism) বেদান্ত 'মায়াবাদে'র অতি ভূমি-প্রাপ্ত বৌদ্ধ 'শূন্যবাদের'ই রূপান্তর। উভয় দার্শনিক মতই বস্তুতঃ জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদের সংযোগ স্থল। একদিকে Lockeএর দার্শনিক মত হইতে Bishop Berkleyর মত আলোক পাইতেছে, অপর দিকে Humeএর মত Kantএর মতকে প্রকাশিত করিতেছে।

Leibnitz

Spinoza ও Lockeএর প্রতিপক্ষতায় Berkley ও Kantএর পূর্ব্বে জর্ম্মেনিতে Leibnitz দর্শনের অভ্যুদয় হয়। Spinoza বাহ্য পদার্থের নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া, এক পরমাত্মারই পদার্থত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; Leibnitz তৎস্থলে বহু তত্ত্বের (Monad) প্রচার করেন। সাংখ্যের পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতির ন্যায়, তাঁহার Monadএ চৈতন্য ও সক্রিয়তা উভয়ই আছে। বস্তু মাত্রেই গুণ বৈষম্যের দ্বারা প্রকৃতি ভেদের ন্যায়, তাহার Monadও, পরস্পর বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র। Leibnitzই ভাষার সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার জন্য Jesuit ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে বিভিন্ন ভাষার অনুশীলনার্থ প্রথম প্রোৎসাহিত করেন। ভারতবর্ষে Jesuitগণ ধর্ম্ম প্রচারার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা হিন্দু-দর্শনের স্থূল মর্ম্ম তাঁহার বিদিত হওয়া অসম্ভব নহে।

Lockeএর অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিবাদে Leibnitz আত্মা ও চিত্তকেই সমস্ত জ্ঞানের কারণ করিয়া গ্রহণ করেন। সমস্ত জ্ঞানের, এমন কি, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞানের পর্য্যন্ত উৎপত্তিক্ষেত্র আত্মা। সুতরাং জ্ঞানের বাহ্য উদ্বোধক স্বীকারের আবশ্যকতা দেখা যায় না। ইহাতে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে বেদান্তে'মায়াবাদ' প্রকটিত হইয়াছে।

Berkley

Berkleyর মতে মনে জ্ঞানরূপে অস্তিত্ব ব্যতীত বস্তুর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অনুভবযোগ্যতাই বস্তুর প্রধান ধর্ম্ম। আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানের পরমাত্মাই একমাত্র আধার। তাহাতে যাহা জ্ঞানের আদর্শ (archetype) আমাদিগেতে তাহাই প্রতিবিম্ব (ectype)। Berkley মায়াবাদে বাহ্যজগতের কোন স্থান নাই, সমস্তই জ্ঞানমাত্রাবশেষ। এই তত্ত্ব বৌদ্ধ-দর্শনের বিজ্ঞানমাত্রেরই নামান্তর।

Kant.

Kantএর দর্শনে বাস্তব-বাদ ও জ্ঞান বাদ বা মায়াবাদ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে। Kantএর মতে বাহ্যবস্তু জ্ঞানের উদ্বোধক মাত্র, কিন্তু বুদ্ধির সহযোগ-ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারেনা। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত ও অনুরঞ্জিত হইয়াই কেবল বস্তু আমাদিগের অনুভূতিতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে

বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য স্বতঃই বস্তুতে আরোপিত হইয়া, বস্তুকে মানসিক নূতন আকার প্রদান করে। এই ব্যাখ্যায় একদিকে যেমন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে, তদ্রূপ অপর দিকে অনুভূতি বিষয়ে বুদ্ধিরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইতেছে। বস্তুর স্বরূপ স্বীকার্য্য হইলেও আমাদের অজ্ঞেয়; দৃশ্যরূপ বুদ্ধিরই রচিত। ইহাই Kant দর্শনের সার মর্ম্ম। ইহা হইতে Kant দর্শনের মূল উপপত্তি এই দাঁড়াইয়াছে যে (১) আমরা কেবল দৃশ্যরূপ অবগত হইতে পারি, স্বরূপ অবগত হইতে পারি না, (২) তথাপি অভিজ্ঞতা মাত্রই আমাদের জ্ঞানের আকর, সুতরাং বুদ্ধির সহিত অসম্বদ্ধ বস্তুর বিজ্ঞান হইতে পারেনা (there cannot be a science of the unconditioned)

বস্তু স্বরূপতঃ চিত্তেরই সহিত অভিন্ন চিন্তা প্রকৃতিক হইতে পারে বলিয়া, Kant যে অনুমানের আভাস দিয়াছেন, তাহাই পরবর্ত্তী দার্শনিক মতের ভিত্তি হইয়াছে।

প্লেটোর দর্শনমত আলোচনায়, প্লেটো ও শঙ্করের মায়াবাদের সহিত Kantএর মায়াবাদের Dr. Deussen-কৃত তুলনা উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা Berkley ও Kant-এর মায়াবাদের অপূর্ণতা যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বিদূরিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই আচার্য্য মোক্ষমূলের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এতৎসম্বন্ধে প্রকাশিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিব। Berkley ও Kant বাহ্য জগৎকে মায়ামাত্র বলাতে তাঁহাদিগের দর্শনমত লৌকিক সংস্কারের বিরোধী হইয়া সাধারণের পক্ষে দুরবগাহ হইয়াছে; কিন্তু মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য লোকব্যবহারের জন্য জগতের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া, তাঁহার দর্শনের সহিত সাধারণের ধারণার চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন,—তাঁহার মতে ব্যবহারিক জ্ঞানই তাত্ত্বিকজ্ঞানের সোপান স্বরূপ—

"But besides the concession to which we alluded before, that for practical purposes ('ব্যবহারার্থম্') things may be treated as real, whatever we may think of them, in our heart of hearts, a concession, by the by, which even Berkley and Kant would readily have allowed .. . " Page 210

বেদান্তের মায়াবাদ ও Kantএর সমালোচনাত্মক দর্শন তুলনা করিলে, দেখা যাইবে, শঙ্করের মায়াবাদ Kantএর সূক্ষ্ম সমালোচনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। যেস্থলে Kant অনুভূতির প্রকার (forms of intuition) ও বুদ্ধির প্রক্রিয়া সকল (categories of thought) যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেস্থলে, বেদান্ত সে সকলকে রূপ মধ্যে গণ্য করিয়া মায়ার খেলামাত্র বলিয়াছেন। কেবল ব্যবহারার্থং ইহাদের যাথার্থ্য কল্পিত হইয়াছে। Kantও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে ইঁহাদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এস্থলে আমরা আচার্য্য মোক্ষমূলরকৃত তুলনা উদ্ধৃত করিলাম :—

"This might become clearer, if we took Brahman for the Kantian 'Ding an sich', remembering only that, according to the Kantian philosophy, the Rupa, the forms of intuition and the categories of thought, though subjective, are accepted as true, while the Vedanta treats them also as the result of Nesciense, though true for all practical purposes in this phenomenal life. In this sense the Vedanta is more sceptical or critical than even Kant's critical philosophy; though the two agree with each

other again, when we remember that Kant also denies the validity of these forms of perception and thought when applied to transcendent subjects. According to Kant it is man who creates the world, as far as its form (নামরূপ) is concerned, according to the Vedanta this kind of creation is due to অবিদ্যা। And strange as it may sound to apply the name of অবিদ্যা to Kant's intention of sense and his categories of the understanding, there is a common element in them, though hidden under different names Page 226

Fichte.

কেণ্ট, জ্ঞেয়ের যে গৌণকল্প অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, Fichte তাহাও নিরাস করিয়া কেবল জ্ঞাতারই প্রামাণ্য স্থাপন করেন। জ্ঞাতা স্বয়ং অনন্ত, তাহা হইতেই সমস্ত সান্ত প্রসূত হয়। তাহার মতে জ্ঞাতাই সর্ব্ব স্বরূপ ("Ich ist Alles" the I is every thing)। 'ইহা বেদান্তের সোঽহং' তত্ত্বেরই ভাষান্তর মাত্র। ইহা Spinoza দর্শনেরই বিপরীত দিক্ (an inverted idealistic Spinozism)

Spinoza চিৎ ও অচিতের অতিরিক্ত ব্রহ্মে ব্রহ্মাণ্ড বিলীন করিয়া উভয়ের ভেদ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। Fichte চিৎ বা জ্ঞাতাকেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র করিয়া অচিৎ বা জ্ঞেয়ের সম্পূর্ণ অপলাপ করিলেন। রামানুজের ন্যায় জ্ঞাতা বা জীবাত্মাকে Fichte পরমাত্মারই অংশ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। পরমাত্মা (absolute ego) আত্মোপলব্ধির জন্য আপনাতেই ভেদ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে ও এই আপেক্ষিক জ্ঞানে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞাতা (জীবাত্মা) ও জ্ঞেয় (জগৎ) রূপে প্রতীত হয়। জীবাত্মা, আপনার স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য এই ভেদ ধ্বংস করিতে নিয়ত ব্যাপৃত থাকে।

"To attain consciousness of itself, the absolute ego, must limit itself, and by this self-limitation it gives rise to a non-ego, with which however, is quite as much a part of itself, as the limited ego, with which alone it is consciously identified The infinity of the ego, however, reappears as an impulse to strive against this self-made limit" Hegel, Blackwood's Philosophical classics, P 126

Schelling

Fichteর একদেশদর্শিতাকে পূর্ণতা প্রদান করিবার জন্য Schelling, Fictheর 'The I is everything' 'যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র' এই মূল সূত্রের সহিত 'Alles ist Ich' 'everything is I' 'সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি' এই মূল সূত্রের যোগ করিলেন। তাহার মতে চিৎ ও অচিৎ উভয়েরই অন্তঃ প্রকৃতি এক পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাহাদের বাহ্য ভেদ ছায়াবাজি মাত্র ; (to regard all conflict and antagonism as but the play of shadows) আপাতদৃশ্য, তাত্ত্বিক নহে। Schellingএর মতে বস্তু সকলের ধর্ম্মগত কোন প্রভেদ নাই, কেবল মাত্রাগত প্রভেদ (there are no qualitative but only quantitative difference in things) Schellingএর দর্শন রামানুজের 'জগৎ সত্য' মতেরই ব্যাখ্যা।

Hegel.

Schellingএর দ্বৈতবাদ অপাস্ত করিবার জন্য, Hegel 'অদ্বৈত-তত্ত্ব বস্তু নহে কিন্তু জ্ঞাতা' ('the absolute is not substance but subject') Kant দর্শনের এই প্রথম উপদেশকে Schellingএর প্রতিবাদ স্বরূপ দৃঢ়তা সহকারে, পুনঃ প্রচারিত করিলেন। ইহাই Hegel দর্শনের মূল সূত্র।

ইহারই ব্যাখ্যা Hegel দর্শনের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। ইহার অর্থ এই যে, যে একত্ব সমস্তেরই আশ্রয়, যাহাতে সমস্তেরই শেষ মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা, আত্মানুভবের একত্ব বই আর কিছুই নহে—'The unity to which all thing are to be referred and in which they must find their ultimate explanation, is the unity of self-consciousness.' Hegel, Blackwood's Philosophical Classics P. 128

Hegel বলেন, চিৎ ও অচিৎ উভয়েরই মূলে এক মহাপ্রাণ। উভয়ই তুল্যরূপে সত্য হইলেও চিতেরই অচিৎ অপেক্ষা প্রাধান্ত। প্রকৃতিতে অদ্বৈততত্ত্বেরই চরিতার্থতা, অনন্ত বিচিত্র বিলাস ও বিকাশ হইলেও, চিৎ (জীবাত্মা বা জ্ঞাতা) আত্মসম্বিৎ বিশিষ্ট হওয়াতে, যখন তত্ত্বজ্ঞান রূপে ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে উপসংহৃত করে, তখনই বহুধাবিভক্ত জগতের বাহ্য প্রসারিত সমস্ত অবয়ব তাহার অন্তর্ভূত হইয়া যায়, ও সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মা ইহাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের আকারে পরিবর্তিত করিতে থাকে। ইহাতে বাহ্য সম্পর্ক তিরোহিত হইয়া, সমস্তই মানসিক ব্যাপারে পরিণত হওয়াতে, একত্বজ্ঞানেরই (পরমাত্ম জ্ঞানেরই) অবিরত বিবেক হইতে থাকে।

"Though, in nature, we have the realisation, the infinitely diversified mediation and evolution of the absolute, yet spirit, as being essentially self conscious, when it draws back the universe into itself, as it does in knowledge, at once includes in itself the outwardly expanded totality of this manifold world, and at the same time over-reaches and idealises it, taking away its externality to itself and to the mind, and reflecting it all into the unity of thought." Hegel—Page 61.

বেদান্তের আত্মসাক্ষাৎকার চিত্র ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথাবিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

আত্মজ্ঞানীর, সমস্ত আসক্তি রহিত ও সমস্ত বন্ধন মোচিত হয়। হিন্দু দর্শনের তত্ত্বজ্ঞানের এই অবস্থাও, Hegelএ স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি নমে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"

"আত্মবিবেকের দ্বারা অপার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প জ্ঞান-পারাবার প্রবাহিত হইতে থাকে।"

Hegel দর্শনে রামানুজ ও বল্লভ মতের সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়।

আত্মবিৎ জ্ঞাতা (self-conscious subject) হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান (unity of thought) Hegel দর্শনের পর্য্যাপ্তি হইয়াছে। এই একত্বজ্ঞানে বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্তে অভেদবাদ প্রতিভাত হইয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও Hegelএর Absolute Pantheism একার্থক। Hegel দর্শনে ইউরোপীয় দর্শনের চরম উন্নতি।

কিন্তু বেদান্তের পূর্ণ ব্যাখ্যা ও পরিতৃপ্তি ইহাতেও হয় নাই। এইজন্যই Kant শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ সোপেনহেয়ার (Schopenhauer) উপনিষদের পরমাণুবাদমাত্র পাঠ করিয়াই হর্ষ ও সম্ভ্রমের আবেগে বলিয়াছিলেন—"In the whole world there is no

study, except that of the original (of the Upanishads), so beneficial and so elevating as that of the Oupnekhat (Persian translation of the Upanishads) It has been the solace of my life, it will be the solace of my death." 'সমগ্র পৃথিবীতে মূল উপনিষদের পরে উপ্নেখতের (মূলের পারস্যানুবাদের) অধ্যয়নের ন্যায় হিতকর ও উৎকর্ষ বিধায়ক আর কিছু নাই। ইহা আমার জীবনে শান্তি হইয়াছে, আমার মৃত্যুতে শান্তি হইবে।

আচার্য্য মোক্ষমূলরও, স্বপ্রণীত 'ভারতীয় ষড়দর্শনের ইতিহাসে', ইউরোপীয় দর্শনের তুলনায় বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে নিম্নলিখিত বাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছেন—

"None of our philosophers, not excepting Heraclitus, Plato, Kant or Hegel, has ventured to erect such a spire, never frightened by storms or lightnings " p 239-40.

ঝটিকা ও বজ্রপাতে ভীত না হইয়া এরূপ উচ্চ চূড়া নির্ম্মাণে আমাদের কোন দার্শনিকই (Heraclitus, Plato, Kant ও Hegelও যদিচ ইহাতে বাদ পড়ে নাই) সাহসী হন নাই।

"If I can admire the bold climbers scaling mount Gouri Sankar, I can also admire the bold thinkers toiling up to heights of the Vedanta, where they seem lost to us in clouds and sky." p 241

যদি গৌরীশঙ্কর গিরি আরোহণকারীদিগের সাহসের প্রশংসা করিতে হয়, তবে বেদান্তের উচ্চ শিখারোহণ-শ্রমপটু সাহসিক তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণও প্রশংসা-যোগ্য, কারণ, বেদান্তের উন্নত শৃঙ্গে মানব দর্শনের অবিষয়ীভূত হইয়া তাঁহারাও মেঘ ও শূন্যে বিলীনপ্রায় প্রতীয়মান হন।

বর্ত্তমানে বেদান্তমত কেবল ইউরোপীয় দর্শনে নহে, কিন্তু বিজ্ঞানেও মূলমন্ত্র হইতেছে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ইংলণ্ডের রাজকীয় বিজ্ঞান সভায়, পাশ্চাত্য উন্নত বিজ্ঞানসমাজে এই একত্বের কথা ঋষিদিগের নামে অতি তেজস্বিনী ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছেন—

"He concluded with the remark that this continuity between the organic and inorganic worlds enabled them to begin to understand the quotation from one of the ancient books of his race—"They who see one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth, unto none else" Times, May 14, 1907

"তিনি এই মন্তব্যের দ্বারা উপসংহার করিলেন যে, জড় ও জীব জগতের এই সংযোগ, তাঁহার স্বজাতীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকলের একমত হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ বাক্যটীর মর্ম্ম গ্রহণে সহায়তা করিতেছে—চিরন্তন সত্য কেবল তাঁহাদিগেরই আয়ত্ত, যাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিবর্ত্তন-বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দেখিতে পান।"

সুসভ্য মার্কিন দেশে পৃথিবীর মহা ধর্ম্ম সভায় বেদান্ত মতের প্রতিনিধি বাগ্মীবর স্বামী বিবেকানন্দ সগর্ব্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি বলিয়াছিলেন—"The high spiritual flights of Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like the echoes" Paper on Hinduism, Read at the World's Parliament of Religion. "বেদান্ত দর্শন নয় উচ্চ আধ্যাত্মিক উৎক্রমণ অধুনাতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যাহার প্রতিধ্বনির ন্যায় বিবেচিত হয়।"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।

জন্মস্থান বিচার।

নব্য স্মৃতিব প্রবর্ত্তক মহাত্মা বঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তদীয স্মৃতি গ্রন্থাবলীতে নিজ পরিচয় সম্বন্ধে মাত্র এই দুইটী কথা বলেন (১) তাঁহাব পিতাব নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য এবং (২) তিনি বন্দ্যঘটী কুলেব ব্রাহ্মণ। তাঁহাব জন্মভূমি কোথায়, সেই সম্বন্ধে তিনি নিজ গ্রন্থে কিছুই উল্লেখ কবিয়া যান নাই।

বঙ্গের সারস্বতপীঠ নবদ্বীপ অতি পূর্ব্ব-হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রস্থান রূপে পরিণত হইয়া আসিতেছিল। স্থানটী আবার গঙ্গা তীরবর্ত্তী হওযাতে বাঙ্গালার নানা স্থানের লোক প্রথমতঃ অধ্যয়নার্থ আসিযা, ভাগীরথীতে নিত্য স্নানার্থ এই স্থানটী অনুকূল মনে কবিয়া, এই খানেই ঘর বাড়ী বাঁধিয়া অবস্থান কবিত। আবার যাঁহারা প্রতিভাশালী পণ্ডিত হইতেন, তাঁহারা আপন দেশে ফিরিয়া গিয়া টোল সংস্থাপন কবিলে আশানুরূপ ছাত্র জুটিবে না, মনে কবিযা, স্বীয় প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সাধনার্থ, এই পাণ্ডিত্যের কেন্দ্র ভূমিতেই চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এখানেই বসবাস করিতেন।

নবদ্বীপবাসিগণ, এবং অনেকেই, নবদ্বীপ-মহিমা-কীর্ত্তন-কালে রঘুনাথ ও রঘুনন্দনকে নবদ্বীপজাত বলিয়াই কহিয়া থাকেন। রঘুনাথ সম্বন্ধে এখন নিশ্চিত ভাবেই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, তিনি প্রতিভা দ্বারা নবদ্বীপ আলোকিত করিলেও জন্ম দ্বারা শ্রীহট্টভূমির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যাঁহাবা এতদ্বিষয়ক মীমাংসা দেখিতে চান, তাঁহাবা শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক লিখিত বঘুনাথ শিরোমণি বিষয়ক প্রবন্ধ, সাহিত্য পবিষদ পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় পাঠ কবিতে পাবেন। তৎপব এতদ্বিষযে আরও প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে, এই স্থল তৎসম্বন্ধে বিস্তাবিত আলোচনাব উপযুক্ত নহে বলিয়া ঐগুলির উল্লেখ কবা হইল না।

এখন রঘুনন্দন কোন্ স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিযাছিলেন, ইহাই আলোচনার বিষয়। নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী নামক জনৈক ব্যক্তি-রচিত "নবদ্বীপ মহিমা" গ্রন্থে লিখিত হইযাছে :—

"রঘুনন্দনেব পিতাব নাম হরিহব বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য। তিনিও নবদ্বীপে এক জন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার স্মৃতিব টোল ছিল। "সময় প্রদীপ"* নামক স্মৃতিগ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরিহরেব দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠেব নাম রঘুনন্দন, কনিষ্ঠেব নাম যদুনন্দন। যদুনন্দন বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হন। * * * * রঘুনন্দন যেমন শাস্ত্র ছিলেন, লেখা

---

* "সময় প্রদীপ" নামক একখানি জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ শ্রীহট্ট প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের টোল পরীক্ষায় পাঠ্য গ্রন্থ রূপে প্রচলিত আছে। উহার প্রণেতা শ্রীহট্টের দ্বিতীয় রঘুনন্দন, কাব্য প্রকাশের টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার। রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের" ন্যায় ইনিও "অষ্টাবিংশতি প্রদীপ" লিখিয়া গিয়াছেন।

পড়াতেও তাঁহার তেমনি মনোযোগ ছিল। তিনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া ব্যাকরণ, অভিধান ও কাব্যাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। * * * * * * হরিহর কুলীন ছিলেন। কুলীনদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ তৎকালে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু হরিহর পুত্রের কাব্যাদি পাঠ শেষ হইলে, অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপেই পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহের পরই রঘুনন্দন পিতার নিকট স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। * *" ইত্যাদি।

গ্রন্থকার কোথা হইতে এই সকল কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় না। তদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় আছে :—

"আমি নবদ্বীপ নিবাসী। বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদাই নবদ্বীপের প্রাচীন লোকদিগের মুখে নবদ্বীপ মহিমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ও মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নবদ্বীপ সম্বন্ধে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে নবদ্বীপবাসীদের মুখে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহার অনেক কথাই দেখিতে পাই। এই জন্য বহুকাল হইতে নবদ্বীপের মহাজনদিগের সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ যতদূর সঙ্গত বোধ হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে।"

ইহাতে এইমাত্র প্রতীত হইতেছে যে, রঘুনন্দনের সম্পর্কে উপরিভাগে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য বড় বেশী নয়। এই গ্রন্থকার রঘুনাথেরও জন্মস্থান যে নবদ্বীপই বলিবেন, ইহা বলা বাহুল্য।

কিছু কাল হইল কোনও ইংরেজী কাগজে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত দেখিয়াছিলাম; ইহাতে যতদূর স্মরণ হয়, রঘুনাথ রঘুনন্দনকে ত নবদ্বীপ-জাত বলা হইয়াছেই, অধিকন্তু তাঁহাদের জন্ম মৃত্যুর সনও উল্লিখিত আছে। ঐ প্রবন্ধটী অনুসন্ধান করিয়াও আর পাইতেছি না, অথচ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট, এই প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া থাকিলে আমাকে একখণ্ড পাঠাইতে, এবং রঘুনাথ রঘুনন্দনের জন্মভূমিরও জন্ম-মৃত্যু অব্দের বিষয় কিরূপে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা জানাইতে একখানি চিঠিও লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, উহার উত্তর পাই নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বপক্ষ যাহা, তাহা এক প্রকার বলা হইল। এক্ষণে উত্তর পক্ষ ক্রমশঃ বলা হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তদীয় উদ্বাহ-চন্দ্রালোকের "বিজ্ঞাপন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ও ভট্টাচার্য্যা বন্দ্যঘটী বংশং পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশঞ্চ জন্মনালঙ্কৃত বন্তঃ। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে তেষাং বংশ্যাঃ সন্তি। পরন্তু তেষাং নিবোসো নবদ্বীপে জাত ইতি কিংবদন্তী। কয়াপি পুণ্যসম্পদা তৈর্জ্জন্মনালঙ্কৃতেবংশে প্রদেশে চাস্মপি জনঃ সমজনিষ্ট। তেথস্মং সগোত্রাঃ পূর্ব্বতনাশ্চেতা বতাহপিমৎ পূজনীয়াঃ॥" ইত্যাদি।

শৈশবে পাঠ্যাবস্থায় একদা দৈববাণীর ন্যায় শুনিয়াছিলাম, রঘুনন্দনের জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ উপবিভাগস্থ নবিগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী মন্দারকান্দি নামক গ্রামে। দুঃখের বিষয় এই যে, আজ ৬।৭ বৎসর যাবৎ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সংকলন কল্পে সমগ্র শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম নগর, পণ্ডিত বিষয়ী, প্রাচীন অর্ব্বাচীন, অসংখ্য স্থল হইতে কত কাহিনী পাওয়া গেল, কিন্তু রঘুনন্দনের বিষয় বিশেষ কিছু জানা গেল না। "রঘুনন্দন" "রঘুনন্দন" করিতে করিতে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপের ন্যায় রঘুনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন; তাঁহার বাল্য জীবনী, পিতৃ মাতৃ কাহিনী, এমন কি, বংশাবলী পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল। *

* রঘুনাথ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত অচ্যুত বাবু লিখিত প্রবন্ধ পাঠে অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবগত হইবেন। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ও "বঙ্গের ব্রাহ্মণ কাণ্ড" বৈদিক প্রকরণে ঐ সকল মাল মসলা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেও রঘুনাথ যে পূর্ব্ব বঙ্গের লোক, তাহার সম্বন্ধে কেবল কিংবদন্তী ছিল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত "বান্ধব" পত্রিকায়, ১৩০৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা এবং ১৩১০ সালের আশ্বিন কার্ত্তিক

কিন্তু রঘুনন্দনের সম্বন্ধে ঐরূপ কিছু পাওয়া গেল না। মন্দারকান্দি গ্রামটীতে গিয়াও খোঁজ করা হইয়াছিল; কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না। বন্দ্যঘটী বংশ প্রভব কোনও ব্রাহ্মণও এই গ্রামে কিম্বা ইহার সন্নিকটে কুত্রাপি নাই, কিন্তু ইহাতে আমার বাল্যকালে লব্ধ ধারণাটী দূর হইল না।

অদ্য প্রায় চারি শতাব্দী অতীত হইল, রঘুনন্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এত-দিন পরে তাঁহার জন্মভূমিতে কেহ তাঁহার সংবাদ রাখিবে, এদেশে এমনটী আশা করা বৃথা। তাঁহার বংশীয়েরা পূজনীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথিতানুরূপ শ্রীহট্টের—তথা পূর্ব্ববঙ্গের অন্যত্র অবশ্যই উপনিবিষ্ট হইয়া আছেন। ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই, বরং প্রতিপোষক আর একটী উদাহরণ শ্রীহট্ট হইতেই দিতেছি।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেও আজ প্রায় পাঁচ শতাব্দীর কথা। অধুনা লাউড় গিয়া অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার উত্তর কেহ দিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।* অদ্বৈতবংশের কেহ লাউড়ে দূরে থাকুক, সমগ্র শ্রীহট্ট জিলায়ও নাই, অথচ পূর্ব্ববঙ্গের অন্যত্র অনেকস্থলে আছেন। আজ যদি "অদ্বৈত প্রকাশ" প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে এই কথাটীর উল্লেখ না থাকিত, তবে কি শ্রীহট্টভূমি অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান বলিয়া গৌরব করিতে পারিত?

তবে কি শ্রীহট্ট রঘুনন্দনের জন্মভূমি নয়? মন্দারকান্দি গ্রাম সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট হইতে পারে, কিন্তু শ্রীহট্টই যে রঘু-নন্দনের জন্মস্থান, এই বিষয় সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। শ্রীহট্ট কিছু-দিন আসামভুক্ত হইয়া থাকিলেও, ইহা পূর্ব্ব বঙ্গেরই একটী প্রকৃষ্ট অংশ সুতরাং আমার এই ধারণা পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে। *

এই সিদ্ধান্তের অবাস্তব আরও প্রমাণ আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থাবলী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তৎসময় শ্রীহট্ট অঞ্চলের বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ পুণ্যভূমি নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। চৈতন্য দেবের পিতা, মাতামহ, শ্বশুর, মাতৃ-স্বসৃপতি প্রভৃতি ত ছিলেনই, এ ছাড়া আরও বহুব্রাহ্মণ শ্রীবাস, রঘুনাথ, অদ্বৈত প্রভৃতি এবং মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি কায়স্থ বৈদ্য, শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে গিয়া, অবস্থান করিতে-ছিলেন। সকলেই সবিশেষ প্রতিভাবান্—যেন প্রতিভার বিকাশ-ভূমি বলিয়াই নব-দ্বীপের আশ্রয় লইয়াছিলেন। চৈতন্য ও রঘুনাথ সমপাঠী ছিলেন, উভয়ে সৌহার্দ্দও ছিল বিলক্ষণ এবং ইহারা উভয়েই শ্রীহট্টীয় সুতরাং এক সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই, বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা ছিল।† রঘুনন্দন বোধ হয় ইঁহাদের অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ, অতএব অল্পবয়সে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নবদ্বীপ পরিত্যাগ করাতে তদীয় জীবনীতে রঘুনন্দনের কোনও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ পরিত্যাগের পরে যখন রঘুনাথ মধ্যাহ্ন-মার্ত্ত-ণ্ডের ন্যায় নবদ্বীপাকাশে দেদীপ্যমান ছিলেন, তখন রঘুনন্দনকে তদীয় সম্পর্কে আসিতে

সংখ্যায় এই বিষয় উল্লিখিত আছে। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় সম্পাদিত কুসুমাঞ্জলির ভূমিকায়ও রঘুনাথ শিরোমণি পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

* সুখের বিষয়, সম্প্রতি লাউড়ের অন্তর্বর্ত্তী একটী স্থান অদ্বৈত প্রভুর জন্মভূমি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং তথায় একটী আখড়াও স্থাপিত হইয়াছে।

* পূজনীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে এতৎ সম্বন্ধে আমার মত, অর্থাৎ রঘুনন্দন শ্রীহট্টজাত, এই কথা, জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি ইহার প্রতিবাদ ত করেন নাই বরং রঘুনন্দন পূর্ব্ব বঙ্গের লোক, ইহার সমর্থন কল্পে তদীয় "উদ্বাহ চন্দ্রালোক" একখণ্ড কৃপা করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার "বিজ্ঞাপন' অংশ হইতে তদীয় মত ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হই-য়াছে।

† রঘুনাথের সমদর্শিতা দেখিয়া চৈতন্য দেবের ন্যায়ের টীকার গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন কাহিনী প্রভৃতিই ইহার প্রমাণ।

দেখিতেছি। "নবদ্বীপ মহিমা" হইতেই তৎসম্বন্ধে একটী গল্প উদ্ধার করিলাম :—

"কথিত আছে, রঘুনন্দন আপন পুত্রের উপনয়ন-স্বমতে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ উপনয়নের পর তাঁহার পুত্র কোনও কার্য্যোপলক্ষে রঘুনাথ শিরোমণিকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া প্রথানুসারে তাঁহাকে নমস্কার করেন। কিন্তু শিরোমণি একটু চিন্তা করিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন না। দুঃখিত হইয়া বালক পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, "জেঠা মহাশয়কে নমস্কার করিলাম, কিন্তু তিনি প্রতি-নমস্কার করিলেন না"। রঘুনন্দন শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

যথাসময়ে শিরোমণি উপস্থিত হইলে রঘুনন্দন, তাঁহাকে প্রতিনমস্কার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শিরোমণি বলিলেন, "ভাই হে, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তুমি যে মতে পুত্রের উপনয়ন দিয়াছ, তাহাই যদি শাস্ত্রের প্রকৃত মত হয়, তাহা হইলে তোমার তদনুসারে উপনয়ন না হওয়ায় তুমি নিজে অব্রাহ্মণ রহিয়াছ, সুতরাং অব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্রকে যদি শতগাছি যজ্ঞসূত্র দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে কোন মতে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। আর যদি তোমার মত যথার্থ শাস্ত্রসম্মত না হয়, তাহা হইলে তোমার পুত্রও এক্ষণে ব্রাহ্মণ হয় নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি তোমার পুত্রকে নমস্কার করি নাই।" তদবধি রঘুনন্দনের সংস্কার-তত্ত্বের উপনয়ন প্রথা অপ্রচলিত হইল। এক্ষণে উপনয়ন প্রাচীনমতেই হইয়া থাকে।"* এই কাহিনীটি হইতে সূচিত হইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে সামাজিক ঘনিষ্ঠতাও ছিল। রঘুনাথ বৈদিক ছিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন বন্দ্যঘটীয় ছিলেন, উঁহাদের মধ্যে সামাজিকতার ঘনিষ্ঠভাব অন্যত্র অসম্ভব হইলেও শ্রীহট্টের বলিয়াই সম্ভব; কেননা শ্রীহট্টে রাঢ়ী বৈদিক বারেন্দ্র ভেদ কদাপি ছিল না, এখনও নাই।

রঘুনাথ রঘুনন্দন! নামেরই বা কি ঘনিষ্ঠতা। যদি আমরা তাঁহাদের বংশগত ভিন্নতা না জানিতাম, তবে "জেঠা মহাশয়"কে ছেলের পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদরই ভাবিতাম। প্রতিভারও উভয়তঃ কি সাদৃশ্য। একজন মিথিলার দর্পচূর্ণ করিয়া ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন পূর্ব্বক, অপরে সেই মৈথিল বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির প্রসার খর্ব্ব করিয়া স্মৃতির প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া বঙ্গের তথা নবদ্বীপের গৌরব ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন। একই প্রদেশের দুইজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যদি একত্র ভিন্ন স্থানে যান, তন্মধ্যে যদি এক জন বিষয় বিশেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তবে অপরেও বিষয়ান্তরে তদ্রূপ প্রতিপত্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হন।—ইহা স্বাভাবিক এবং তন্নিমিত্তও উভয়েই শ্রীহট্টের লোক বলিয়া ধারণা করা অনুচিত বোধ হয় না। আর একটী কথা এস্থানে উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রীহট্টের অতি অল্পাংশ ভিন্ন—সেও অতি অল্প দিন যাবৎ প্রবর্ত্তিত—রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলিত নহে। ইহা বরং রঘুনন্দনের শ্রীহট্টিত্বই প্রমাণিত করে। কেননা ইংরেজী প্রবাদ বাক্যই ইহার সমর্থক :—Prophets are never honoured in their own country" (মহা পুরুষেরা স্বীয় জন্মভূমিতে কদাপি সম্মান লাভ করেন না)। সংস্কৃতেও কি "জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিম্?" প্রভৃতি উক্তি নাই? ফলতঃ স্বদেশীয়েরই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রঘুনন্দন যেমন মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই স্বদেশীয়দের হিংসামূলে তাঁহার মত নিজের সমাজে প্রচলিত হয় নাই। নৈয়ায়িক শিরোমণির একটী মাত্র ফক্কিকার চোটে সংস্কার-তত্ত্বের উপনয়নটা উড়িয়া গেল। রঘুনন্দনের পরম ভাগ্য যে অন্যান্য বিষয় সেই কুশাগ্র বুদ্ধির তর্কের আবর্ত্তে পড়িয়া মারা যায় নাই।*

* এই গল্পটী অলীক না হইবারই কথা, কেননা ইহার সঙ্গে একটা বড় মত বিষয় জড়িত রহিয়াছে।

* এবিষয়ে এরূপ বিপরীত কল্পনা না করিলেও বোধ হয় কোন হানি নাই। কোনও একটা নূতন মত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে বহু সময় লাগে, বিশেষতঃ যদি তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। হয়তঃ সেইজন্যই

রঘুনন্দনকে শ্রীহট্টে জাত বলিলে যদি নবদ্বীপের গৌরব মাহাত্ম্যের অণুমাত্রও হানি হইত, তাহা হইলে এই প্রবন্ধ প্রকটনের প্রয়াস পাইতাম না। দূরদেশ হইতে লোক আসিয়া যে স্থানটীকে প্রতিভা বিকাশের অনুকূল মনে করিয়া অবলম্বন করে, স্থান-মাহাত্ম্য বলিয়া যদি একটা কথা থাকে, তবে উহা ঐ স্থানেই শুধু প্রযোজ্য। যে মাহাত্ম্য ব্যক্তি বিশেষ-নিরপেক্ষ, সেই মাহাত্ম্যই প্রকৃত মাহাত্ম্য; কেবল রঘুনাথ রঘুনন্দন দ্বারাই যে নবদ্বীপ মহিমান্বিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাঁহাদের দ্বারা উহার মহিমা প্রমাণিত হইয়াছে। কেন না, এই স্থানের মহিমা আছে বলিয়াই উঁহারা স্বদেশ ছাড়িয়া জীবনের অত্যাবশ্যক অংশ, কৈশোর যৌবন বার্দ্ধক্য, এইখানেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার "বীজ-ভূমি" অপেক্ষা "লীলাক্ষেত্র" হওয়াই প্রকৃত গৌরবের হেতু—তাই বারাণসীর এত গৌরব, বর্ত্তমান কলিকাতার এত নাম ডাক।

নবদ্বীপ মহিমার লেখক নবদ্বীপকে রঘুনন্দনের জন্মভূমি রূপ নির্দ্দেশ করিয়া, অথবা তদঞ্চলস্থ জনসাধারণ লোক পরম্পরা নবদ্বীপকেই রঘুনন্দনের জন্মভূমি ভাবিয়া দুই একটা গল্প গুজবের সৃষ্টি করিয়া যে একটা অস্বাভাবিক কিছু করিয়াছেন, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না, বরং যেখানে যাঁহাকে দেখা যায়, সেই স্থানটীকে তদীয় জন্মস্থান ভাবাই সাধারণ্যে স্বাভাবিক; বিশেষতঃ যদি বহুকাল মধ্যে অন্তত্র হইতে কোনও দাবি দাওয়া না হয়। অন্য স্থান হইতে যদি সম্প্রতি রঘুনন্দনের নিমিত্ত দাবি আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য নবদ্বীপবাসিগণের ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ নাই, কেননা এইরূপ দাবি দাওয়া স্বাভাবিক। গ্রীসের অন্ধকবি হোমারের মৃত্যুর পর তাঁহার নিমিত্ত সাতটী প্রসিদ্ধ নগরী বিবাদ বিসংবাদ করিয়াছিল, (seven rival cities contend for Homer dead)।

আশা করি, শ্রীহট্টের পক্ষ হইতে এই দাবিটী সুধী সমাজে উপেক্ষিত হইবে না। *

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

শ্রীহট্ট প্রদেশে রঘুনন্দনের মত পৌছিতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে।

* এই দাবির পোষকতায় মাতব্বর সাক্ষীও উপস্থিত করিতেছি। মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু ন্যায়সাংখ্যচঞ্চু মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, যখন তিনি সেরপুরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তখন সেরপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বাপুহে, তোমরা কম নও, যেস্থানে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তোমরা সেই শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোক।' ন্যায়সাংখ্যচঞ্চু মহাশয় আরও বলেন যে একদা কলিকাতায় স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের আবাস বাটীতে বহু পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং তৎস্থানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন, তখন রঘুনন্দনের জন্মভূমির আলোচনায় সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে মন্তব্য হয়, যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীহট্টেরই লোক ছিলেন।

জ্ঞানবীর অক্ষয় কুমার দত্ত।

জগতের মানসিক, আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, যে কোন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে একটী অদ্ভুত নিয়মের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মঙ্গলার্থে যখন যে বিষয়ের অত্যাবশ্যক হইয়াছে, পরম কারুনিক পরমেশ্বর দয়াপরবশ হইয়া তখন তাহাই যোগাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজীতে এই ভাবের একটী কথা আছে, "Necessity is the mother of invention" যখন আমরা যে বিষয়ের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা বা অভাব অনুভব করি, তখন সকলে সমবেত হইয়া সেই সার্ব্বজনীন অভাব দূরীকরণার্থ আমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও যুক্তি বৃত্তির বিশেষরূপে চালনা করিতে যত্নবান হই এবং সৎবৃত্তিনিচয়ের প্রকৃত চালনার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ অভাব-মোচনকারী কোন অভিনব সুখপ্রদ উপায় আবিষ্কৃত হয়। পথভ্রমণ কষ্টকর বোধ করিয়া, মনুষ্যবুদ্ধি, বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যানাদি আবিষ্কার করিয়াছে। এইরূপ, জগতের প্রত্যেক উন্নতির মূলে কোন জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের স্থায়ী অভাব-মোচন-স্পৃহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

ফ্রান্সে যখন ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব বা অরাজকতা উপস্থিত, চতুর্দ্দিকে উন্মাদগ্রস্ত সমুদায় ধ্বংসকারী নরপিশাচগণের প্রেতনৃত্য ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, লোকের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া জীবন রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে, সকলেই স্বীয় শোচনীয় পরিণাম দর্শনে ভীত ও ত্রস্ত, তখন দয়ালু জগদীশ্বর কৃপাবিষ্ট হইয়া ফ্রান্সের মঙ্গলার্থ মহাবীর নেপোলিয়নকে পাঠাইয়া দিলেন।

সাহিত্যজগতেও এ স্বাভাবিক নিয়মের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পলাশীযুদ্ধে মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজ বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন এবং দেশীয় মনোমুগ্ধকর আদর্শ বঙ্গবাসীর মানসচক্ষু-সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব ফল ফলিল। বঙ্গের অবস্থা, কি সামাজিক, কি সাহিত্যিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, অতীব শোচনীয়। প্রজ্জ্বলিত আলোকশিখালিঙ্গনকারী পতঙ্গের ন্যায়, বঙ্গীয়যুবকগণ, অনেকে, নয়নমুগ্ধকর আপাতমধুর খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, ইংরাজী বেশভূষা, আদবকায়দা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। তখন এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইল এবং এই প্রয়োজনের ফলস্বরূপ মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়া, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অনেক প্রাচীন মত পরিবর্ত্তন সংঘটন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মেরই অস্থিমজ্জায় পরিপুষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে এক অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করিয়া, খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারের স্রোত একবারে খর্ব্ব করিলেন। কিন্তু ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের দুরাবস্থা সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তখন পরমপিতা পরমেশ্বর দীনা শীর্ণা বঙ্গভাষার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমারকে বঙ্গসাহিত্যের দুঃখ মোচনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। অক্ষয় কুমার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের

কি অশেষ কল্যাণ সাধিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত আভাস নিম্নে বিবৃত করিতেছি। আমি এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, অক্ষয় বাবুর জীবন-সংক্রান্ত অন্য কোন পুস্তকাদি না থাকায়, নিম্নলিখিত প্রবন্ধের যাবতীয় উপকরণাদি মহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ও তাৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকে কোন বিষয়ে উন্নতি করিবার উপাদানস্বরূপ অনেক সদ্‌গুণাবলী উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু কি কি উপায় অবলম্বন করিলে কার্য্যতঃ ভাবী উন্নতিমূলক সেই সদ্‌গুণাবলী আয়ত্ব করিতে পারা যায়, তাহা অল্প লোকেই বলিতে পারেন। সেই জন্য, কি প্রকারে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া আদর্শচরিত্র, বিপুল জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মাগণ স্বীয় জীবনে অসামান্য উন্নতি-সাধন করিয়া জগতে অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অমূল্য নীতিগর্ভ জীবনী পাঠে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। এই সমস্ত মহাত্মাগণের পবিত্র জীবনের সাধু-দৃষ্টান্ত আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সসীম বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সহস্র উপদেশ শ্রবণে, শত সহস্র সদ্‌গ্রন্থপাঠে যে উপকার সাধিত না হয় তাহা আমরা একটী সাধুদৃষ্টান্তে প্রাপ্ত হইতে পারি।

সন ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ, শনিবার, নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী চুপী নামক গ্রামে মহাত্মা অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত ও মাতার নাম দয়াময়ী। তাঁহারা উভয়েই নিজস্বভাবসিদ্ধ পরোপকারিতা, ন্যায়পরতা ও সৌজন্যতাদিগুণে প্রতিবেশী মণ্ডলীর বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। জনক জননীর গুণাগুণ সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। প্রবল পরাক্রান্ত মহাবীর নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট, মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াসিংটন, স্বদেশভক্ত ম্যাটসিনি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের জীবনী পাঠ করিলে সন্তানের ভাবী উন্নতিমূলক চরিত্র-গঠনের প্রতি পিতামাতার, বিশেষতঃ মাতার স্বভাব কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অক্ষয় বাবু তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে মানবচরিত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে পরে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল সংস্করণ সম্পাদন করিয়া একজন অসামান্য সুনীতি-সম্পন্ন বলিয়া পরিচিত হন, স্বীয় জননীর ধর্ম্মপ্রবণতাই তাহার মূল। পুত্র পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে পিতা তাঁহার "হাতে খড়ি" দিয়া প্রায় সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পুত্রের শিক্ষাভার গ্রামস্থ একজন গুরুমহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। ইনি এই বয়সেই পাঠাভ্যাসকালে এরূপ সুশীলতা, বুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, গুরুমহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া, অতিযত্নের সহিত তাঁহাকে অনেক মনোহর ভাবপূর্ণ চাণক্যের শ্লোক পড়াইতেন। যাঁহারা জীবনে, সামাজিক কি নৈতিক, যে কোন বিষয়ে বিশেষ উন্নতি-সাধন করিয়া ইহজগতে অমরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান, তাঁহাদের শৈশবকালীন প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তা কিম্বা ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাতে ভাবী উন্নতির উপাদানগুলি বীজরূপে প্রকাশিত বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবুর সম্বন্ধে এ প্রাকৃতিক নিয়মের

ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহার শৈশবের কথাবার্ত্তায় তাঁহার জীবনের ভাবী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অক্ষয় বাবু খিদিরপুরে পিতৃব্যপুত্রদের বাসায় চলিয়া আসেন এবং তথায় কলিকাতাস্থ হিন্দুকলেজ ও ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুল সংক্রান্ত নানা কৌতুহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহার ইংরাজী পড়িবার ইচ্ছা বলবতী হয়। বিচারালয়ে পার্শীভাষা প্রচলিত থাকায়, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ সকলে তাঁহাকে পার্শী পড়িতে বলেন, কিন্তু তিনি সকলের অনুরোধ অতিক্রম করিয়া পার্শী পড়া পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় ঘটনাক্রমে একদিন ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় লিখিত একখানি ভূগোল তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়। এই ভূগোল খানি তাঁহার অন্তরে এরূপ এক দুর্দ্দমনীয় ইংরাজী শিক্ষানুরাগ জন্মাইয়া দেয় যে, তখন হইতে ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে কৃতসংকল্প হন। ইঁহার এক পিতৃব্যপুত্র, তাঁহার পরিচিত জয়মাষ্টার নামক একজন ব্যক্তির উপর, তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইবার ভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু ইংরাজীতে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায়, এই মাষ্টার অক্ষয় বাবুকে পাঠ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অক্ষয় বাবু ইহা অতি অল্পবয়সেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কোন উপায় করিতে না পারায়, তাঁহাকে কিছুকাল এরূপ অসুবিধা অতি বিষণ্ণচিত্তে সহ্য করিতে হইয়াছিল; অবশেষে খিদিরপুরে নবপ্রতিষ্ঠিত একটী মিশনরি ফ্রি-স্কুলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ অধ্যবসায় বলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গ, বিশেষ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী থাকায়, তাঁহার খ্রীষ্টান স্কুলে পড়ার সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করেন এবং এক পিতৃব্যের পরামর্শে অক্ষয় বাবু উক্ত স্কুল পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের Oriental Seminaryতে পড়িতে বাধ্য হন। এই বাদানুবাদের সময় তাঁহার যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানতৃষ্ণা ও অধ্যবসায়ের বিপুল পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অতুলনীয়। এখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। বয়স অধিক বোধ হওয়ায় ও অক্ষয় বাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গৌরমোহন বাবু নবীন ছাত্রটীকে ৫ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতে অবশেষে সম্মত হন। প্রার্থিত ৫ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি গুরুতর পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায় বলে সাত মাসের মধ্যে অক্ষয় বাবু ২য় পারিতোষিক লাভ করাতে গৌরমোহন বাবু তাঁহার প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহাকে একেবারেই ৩য় শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। এই শ্রেণীতেই তিনি পোপের অনুবাদিত হোমরকৃত ইলিয়ড কাব্য শিক্ষকের নিকট পাঠ করেন এবং নিজের সাহায্যে বাটীতে ভার্জিল অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ভাষায় অনেক উন্নতি লাভ করেন।

ইলিয়ড পাঠে ইঁহার মানসিক অবস্থায় একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। হিন্দুধর্ম্মের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় জন্মিল ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জগতের কার্য্যকারণ পর্য্যালোচনা দ্বারা যে ধর্ম্ম প্রতিপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। পিতার অসুস্থতা বশতঃ স্কুলের বেতন দানে অক্ষমতা জানাইলে, গৌরমোহন বাবু বিনা বেতনে তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। জগতে কোন সদুদ্দেশ্য সাধনে অনেক বিঘ্নবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। বিদ্যাচর্চ্চার অনুরোধে যে

কষ্ট পাইতে হয়, অধ্যয়নপ্রিয় ব্যক্তির তাহা কখনও কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। অক্ষয় বাবু চেষ্টা ও উদ্যোগ দ্বারা সেই সমস্ত বিপত্তি অতিক্রম করিতেন। এই সময়ে কাশীধামে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাংসারিক এরূপ দুরবস্থা ঘটে যে, তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া সংসারের সাহার্য্যার্থ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু স্কুল পরিত্যাগ করিয়া এরূপ বিষম বিপদে পতিত হইয়াও, তিনি কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত হন নাই, বরং উচ্চ শিক্ষালাভের পথে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা-তৃষ্ণা আরও দ্বিগুণ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এক বৎসরের মধ্যে জ্যামিতির অবশিষ্টাংশ, বীজগণিত, কনিক্‌সেক্‌সেন, ডিফারেন্সিয়েল্ কেল্‌কুলাস প্রভৃতি দুরূহ গণিত শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গ সকল শিখিয়া ফেলিলেন এবং ফ্রেনলজি প্রভৃতি মনোবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ভূগোল সংক্রান্ত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের জামাতা শ্রীনাথ ঘোষ ও দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসুর সহিত কোন এক রহস্য পূর্ণ ঘটনাক্রমে আলাপ হওয়ায়, তাঁহার বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইল। তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা চর্চ্চা করিতেন এবং কিছু কিছু বাঙ্গালা পদ্য রচনা করিয়া নিজ রচনা শক্তি মার্জ্জিত রাখিতেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, ইংরাজী রচনায় সুদক্ষ হইয়া ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিবার চেষ্টা করিলে, দেশের কোন বিশেষ উপকার করিতে পারিবেন না; কারণ ইংরাজী বিদেশীয় ভাষা ও ইংরাজীতে বহুবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে; অতএব বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করাই আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিলেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বর বুঝি নিঃসহায়া বঙ্গভাষার দুরাবস্থা দেখিয়া, শুভক্ষণে, অক্ষয় বাবুর মনে এই সৎ সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া দিলেন। ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা-আলোকিত আমাদের বঙ্গীয় কৃতবিদ্য নব্য-সম্প্রদায়েরা, প্রবল অনুচিকীর্ষা বলে, তাঁহাদের অবশ্য-সেব্য মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া, ইংরাজী ভাষার অনুশীলন ও ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, এখন তাঁহাদের এ ভ্রমপূর্ণ ধারণা ঘুচিয়াছে। এখন দুঃখিনী মাতৃভাষার দিকে আকৃষ্ট হইয়া, ইংরাজী শিক্ষা সাহায্যে তাহার উন্নতি সাধন ও দুঃখ দূরীকরণার্থে ক্রমশঃ তাঁহারা সচেষ্ট হইতেছেন। এতদ্ সম্বন্ধে মহামান্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা তাহার প্রধান নিদর্শন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে অক্ষয় বাবু, প্রায় বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, সংস্কৃত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং হিন্দুজাতির পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান কল্পে অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। পরে কোন সামান্য ঘটনাক্রমে পদ্য প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং এই সূত্রে প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত কিছুদিন তাঁহাকে নানা কর্ম্ম স্থানে বৃথা ঘুড়িয়া বেড়াইতে হয়। কোন আত্মীয় তাঁহাকে আইন শিক্ষা করিতে বলিলে, তিনি তাহাকে উত্তর দেন "যে নিয়ম নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আমার কি ফললাভ হইবে? আমি জগতের অপরিবর্ত্তনীয় স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করিতে চাই।" একদিন

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ইহাঁকে তত্ত্ববোধিনী সভায় লইয়া যান এবং এইসূত্রে ইনি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া ১২৪৬ সালে উক্ত সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং পরে এই সভা কর্তৃক সংস্থাপিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় তিনি ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক পদে মাসিক ১৪৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে শিক্ষোপযোগী এক খানি ভূগোল প্রস্তুত করেন ও "বিদ্যাদর্শন" নামক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রচারারম্ভ করেন। কিন্তু তদানীন্তন কুরুচিপূর্ণ বঙ্গ সমাজ কর্তৃক পত্রিকাখানি আদৃত না হওয়ায়, ছয় মাস পরে উঠিয়া যায়। ১২৫০ সালে কোন কারণ বশতঃ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে হুগলীর অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে উঠিয়া যায়। তত্ত্ববোধিনী সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেও, কলিকাতা পরিত্যাগে জ্ঞান চর্চ্চা ও স্বদেশের মঙ্গলোন্নতি সম্বন্ধে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, তিনি উক্ত পদ অস্বীকার করিলেন, এবং টাকীর জমিদারের বরাহনগরস্থ বাটীতে "নীতি-তরঙ্গিণী" নামে এক সভার সভ্য হন এবং তথায় অনেক নীতিগর্ভপূর্ণ প্রবন্ধ ও প্রস্তাব পাঠ করেন।

১২৫০ সালে সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচারারম্ভ হয় এবং তিনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরমার্থ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য হইলেও; ইহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিয়া, ঐ পত্রিকার তিনি কতদূর উন্নত অবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, জীবনচরিত, দর্শনশাস্ত্রাদি বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিয়া ঐ পত্রিকাকে, তিনি স্বীয় ঐকান্তিক উৎসাহ, উজ্জ্বল প্রতিভা ও আন্তরিক পরিশ্রমের গুণে তদানীন্তন সাহিত্যানুরাগী প্রথিতনামা মহাত্মাগণের কিরূপ আদরের ও যত্নের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে প্রকাশিত যাবতীয় মন্তব্য ও সমালোচনা পাঠ করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তিনি ঐ পত্রিকাকে এতই স্নেহচক্ষে দেখিতেন যে, ইহার উন্নতি কল্পে তাঁহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও অদম্য অধ্যবসায়ের বিষয় পাঠ করিলে সকলের হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এই পত্রিকার জন্য ইনি মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মানুরোধে, বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্স্পেক্টরের পদ, অস্বীকার করেন। পরে নিজ ইচ্ছাব বিরুদ্ধে ঘটনাক্রমে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করিলেও, সর্ব্বসাধারণের শুভকরী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তৎকালে বঙ্গভাষার প্রতি সাধারণতঃ লোকের যে অশ্রদ্ধা ছিল, অক্ষয় বাবুব দ্বারা পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাহা দূরীভূত করিয়া, বঙ্গ ভাষার প্রতি লোকের আস্থা ও অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। বস্তুতঃ এই পত্রিকা যে বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'পদার্থবিদ্যা' 'ধর্ম্মনীতি' এবং 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রবন্ধগুলি এরূপ যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা পূর্ণ এবং ওজস্বিনী ভাষায় এমন মধুর ও গম্ভীর ভাবে রচিত যে, এখন একবার পাঠ করিলে, উহা তদানীন্তন কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মানসিক রীতিনীতি ও স্বাধীন বুদ্ধি

বৃত্তির উপর কিরূপ বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি অনেককে কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়া অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়াছে। অক্ষয় বাবু, এই পত্রিকা সহ-যোগে "সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠা-ইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন।" বিভিন্ন প্রদেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত থাকায়, ইহা বিদেশীয় ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর ভাষা বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই পত্রিকা বাঙ্গালায় ইউরোপীয় ভাব সমূহ প্রচারের প্রথম প্রবর্ত্তক। পরে অক্ষয় বাবু বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ করিয়া, ইহার নানা অংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতঃ, পৃথিবীর একটী উৎকৃষ্ট ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। ইনি স্বভাব গ্রন্থের কিরূপ মেধাবী পাঠক ও পর্য্যালোচক ছিলেন, তাহা মদন মোহন তর্কালঙ্কারের সর্ব্বজন-প্রশংসিত "পাখী সব করে রব" কবিতার অপূর্ব্ব সমালোচনা' পাঠ করিলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তর্কালঙ্কারের মনোহর রচনা-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কেহই তাঁহার কবিতার প্রকৃত স্বভাব বর্ণনের দোষগুলি উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। এতদ্দেশে প্রণালী-শুদ্ধ ভাষাজ্ঞান-সম্পন্ন ও প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির অভাবই, এই অসমর্থতার কারণ বলিতে হইবে। ইউরোপে কিরূপ সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম সমালোচনার প্রণালী প্রচলিত আছে এবং তাহাতে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি গদ্য কিম্বা পদ্য রচনাদি ক্রমশঃ কিরূপ উন্নতি করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা সকলেই অব-গত আছেন। কিন্তু আমাদের দেশে প্রকৃত নিরপেক্ষ সমালোচনার অভাবে বাঙ্গালা ভাষার যে অবনতি হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

এই সময়ে অক্ষয় বাবু শিরোরোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়াও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া তাহার উন্নতি সাধনোদ্দেশে কিরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহা অবগত হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অক্ষয় বাবুর পরামর্শেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "সেকাল ও একাল" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নিজের জ্ঞানো-পার্জ্জন ও অন্যকে জ্ঞান বিতরণ করাই ইহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেই সদুদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গুরু-তর সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও, মেডিকেল কলেজে গিয়া প্রথম বর্ষে রসায়ন ও দ্বিতীয় বর্ষে উদ্ভিদবিদ্যার উপ-দেশাদি শ্রবণ করিতেন। প্রবল জ্ঞান-স্পৃহা সতত বিদ্যমান থাকায়, তিনি হিন্দু-জাতির পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ভাষাদ্বয়ের অনুশীলন করেন। এই বিপুল জ্ঞানের ফল স্বরূপ ইনি "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" বিষয়ক পুস্তকাবলী, "মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে 'ধর্ম্মনীতি', 'পদার্থ-বিদ্যা' ও 'চারুপাঠ' ৩য় ভাগ প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ইংরেজ ও জর্ম্মণ জাতীয় অনেক ব্যক্তি পাঠ করিতেন। "এক দিন General Assemblyর সুবিখ্যাত অধ্যাপক Rev. John Anderson ঐ পত্রিকার প্রশংসা করিয়া ছাত্র-সমীপে বলেন—

"Akhaykumar is Indianising European Science" অর্থাৎ "অক্ষয়কুমার ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে ভারতবর্ষীয় করিয়া তুলিতেছেন।" তিনি তত্ত্ববোধিনী-সভা ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত নানা যুক্তি তর্ক করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ মত রহিত করিয়া, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র, এই মতের ঘোর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সুদৃঢ় সংস্কারবশতঃ বেদে দেবেন্দ্র বাবুর প্রগাঢ় ভক্তি থাকায়, অক্ষয় বাবু ৭।৮ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত যুক্তিতর্ক করিয়া বুঝাইয়া পরিশেষে নিজমতে আনিতে সক্ষম হন। এইরূপে তিনি সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। ব্রাহ্মসমাজে এই অত্যাবশ্যকীয় মতদ্বয়ের আমূল সংস্কার সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া, অক্ষয় বাবু, হৃদয়ে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি লাভ করেন এবং অধিকতর উত্তম সহকারে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মনঃসংযোগ করেন। এতদ্‌সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ওজস্বিনী ভাষায় যে সমস্ত হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহা পাঠ করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। দুর্ব্বলমতি স্ত্রীলোকগণের জন্য দেবেন্দ্র বাবু পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। এই মতের প্রতিবাদ করিয়া অক্ষয় বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন এবং পরিশেষে তাঁহাকে ঐ মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

অক্ষয় কুমার ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না; বলিতেন—"ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম বলে যাহা সঙ্ঘটিত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করার কোনও প্রয়োজন নাই।" পরে বাইবেল, কোরাণাদি যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ও গোতম, নিউটন, লাপ্লাস, বেকন, ক্যাণ্ট প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রন্থ হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব সমুদায় সংগ্রহ করিয়া একটী সুমহৎ উদার মত প্রবর্ত্তন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে বিজ্ঞানসিদ্ধ সুনিশ্চিত তত্ত্ব সমুদায়ের সন্নিবেশ প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে "প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম।" এস্থলে মহাভারতীয় উচ্চভাব পূর্ণ বচনটী উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

নহীদৃশং সংবদনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্।

তাঁহার মতে ব্রাহ্মধর্ম্মে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যাহাতে যুগপৎ উৎকর্ষ সাধিত হয়, তদ্‌বিষয়ে সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই সেই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের উপসংহারে এই বিজ্ঞানসম্মত মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি কার্য্য প্রায় সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু অসংস্কৃত লোকের পক্ষে তাহা বোধগম্য না হওয়ায়, অক্ষয় বাবু সরল বাঙ্গলা-ভাষায় উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনেক হিতসাধন করেন। ফলতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক বিখ্যাত লুথরের ন্যায় অক্ষয়কুমার নানাবিধ ব্রাহ্মমত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া, ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের যে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আর

সন্দেহ নাই। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষাকে অনেক উৎকৃষ্ট উপহার প্রদান করেন। ১৭৭৩ শকে মাঘ মাসে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রথম ভাগ এবং তাহার পরবৎসর ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রচার করেন। উক্ত গ্রন্থ "Constitution of man" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের সারসঙ্কলন। ইহাতে মানব জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য নিচয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কি কি নিয়মাবলী পালন করিলে মানুষ সংসারে যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারে, এই গ্রন্থে তাহা বিশদরূপে উল্লেখ করিয়া, সদুপদেশ প্রদান এবং তৎসমুদয়ের লঙ্ঘনে কি ঘোরতর বিষময় ফল ফলে, তাহা গভীর গবেষণা সহকারে আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে সাংসারিক অতি গুরুতর বিষয়গুলি, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও যুক্তি প্রভাবে ও রচনাপ্রণালীর লালিত্যে এরূপ মধুর ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, একবার মাত্র পাঠ করিলে মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং পাঠকের মনে অক্ষয় বাবুর প্রদর্শিত পথে, ও তাঁহার উপদেশানুসারে, স্বীয় জীবন চালিত করিবার এক প্রবল অভিলাষ জন্মাইয়া দেয়। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি যে অশেষ গুণের আকর, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বহুকাল প্রচলিত অনেক কুপ্রথা উঠাইয়া দিয়া এই গ্রন্থ বঙ্গসমাজের মহৎ উপকার সাধিত করে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায়, কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। এই কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকই পুরুষানুক্রমে ৪০।৫০টী করিয়া বিবাহ করিতেন, বিক্রমপুর-নিবাসী কতকগুলি কুলীন ব্রাহ্মণ যুবক একটী সভা স্থাপন করিয়া এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়ম সকল পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাতে প্রাচীন পক্ষীয়েরা ইঁহাদের প্রতি এত রুষ্ট হন যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেককে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তথাপি যুবক সভ্যগণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিজ নিজ শিক্ষিত মতানুসারে কার্য্য করেন, কদাচ একের অধিক দুটী বিবাহ করেন নাই। লেখার প্রভাবে এরূপ আশু ফলোৎপত্তি অত্যন্ত বিরল। এই পুস্তক নিরামিষ ভোজন ও সুরাপান সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সাধারণের রুচির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। ইহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই বিদ্বৎসমাজ কর্তৃক ইহার সমাদর ও ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ পুস্তক খানির প্রয়োজনীয়তা ও গুণাগুণের যথেষ্ট প্রমাণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এই অমূল্য গ্রন্থ খানি Goldsmithএর সর্ব্বজন প্রশংসিত Deserted Village কিম্বা Travellerএর ন্যায় সকল সময়ে প্রত্যেক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির আদরের বস্তু হইয়া থাকিবে।

১৭৭৪ শকের শ্রাবণ মাসে চারুপাঠ প্রথম ভাগ এবং তাহার দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক যে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পুস্তকাকারে চারুপাঠে লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তক দুইখানি এত প্রচলিত ও সর্ব্বজনপ্রশংসিত যে, ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। ইহা বাঙ্গালা-শিক্ষার্থী সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের জ্ঞানরত্নের আকর বলিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু যতই দুঃখের

বিষয় যে, এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ মহামূল্য পুস্তকের পরিবর্ত্তে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাধিধারী অনভিজ্ঞ নব্যযুবক-প্রণীত অনেক নগণ্য পুস্তক বালকবালিকাদের শিক্ষার্থ কাণ্ড-জ্ঞান-হীন Text-Book-Commitee দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেছে। আমার বিশ্বাস, এই সমস্ত পুস্তক বালক বালিকাগণেব শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী হওয়া অপেক্ষা বরং তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিতে সহায়তা করে। জানি না, অনাথা বঙ্গভাষাব অদৃষ্টে আরও কি আছে!

ইহার পবে চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভাবের হইয়াছে। স্বপ্নদর্শন নামক প্রবন্ধগুলি প্রগাঢ় চিন্তা ও জ্ঞান বৃত্তিব পরিচায়ক এবং গভীব ভাবব্যঞ্জক। প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী পাঠকেব পুস্তকখানি একবাব অন্ততঃ পাঠ কবা উচিত। ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে পদার্থ-বিদ্যা প্রচাবিত হয়। এই বিদ্যা যে বাঙ্গালা ভাষায় কত দূব সবল ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, ইহাই তাহাব আদর্শ স্থল। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি ১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শনে 'বঙ্গ-বৈজ্ঞানিক' নামক প্রবন্ধে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ প্রণীত পদার্থবিদ্যাব সমালোচনায় কতকগুলি ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহেন্দ্র বাবু যদি কোনও ইংরাজী পুস্তক না পড়িয়া কেবল অক্ষয় বাবুব পদার্থ বিদ্যা-খানি পড়িতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, এরূপ মহাভ্রমে পতিত হইতেন না।"

১৭৭৭ শকের মাঘমাসে ধর্ম্মনীতি প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মনীতিতেও শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধনাদি পার্থিব জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থকার অসাধ্য শিরোরোগ প্রযুক্ত বাহির কবিতে পাবেন নাই। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য রূপে পবিগণিত হওয়ায় হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, কাবণ ইহাতে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহেব অবৈধতা, বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় ও অক্ষয় বাবু সমযোগে এই সময়ে অনাথা শোক-ভাব-বিহ্বলা হিন্দু বিধবাদিগের দারুণ দুঃখে দয়াপরবশ হইয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত প্রতিপন্ন কবিয়া উহা প্রচলন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটা বিধবা বিবাহ দিতে সক্ষমও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইঁহাদেব তীব্র যুক্তি ও সমালোচনা ফলে বহু বিবাহাদি সমাজেব অনেক কুপ্রথা উঠিয়া যাইবাব পথ পরিষ্কাব হইয়া যায়। এখন ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বহু বিবাহ প্রথা ত প্রায় একবারে উঠিয়া গিয়াছে, এবং এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পত্নী পবিগ্রহও আজ কাল অতি অল্প লোকেই কবিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ সমস্ত জঘন্য রীতিব পবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহাই মঙ্গল।

১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ এবং ১৮০৪ শকে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। অশেষ গবেষণা ও তর্ক-পূর্ণ পুস্তকখানিব প্রথম প্রকাশিত হইবা মাত্র বিদ্বৎসমাজ সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তৎপাঠে বিপুল আনন্দ প্রকাশ করেন, দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে ইনি ঘোরতর মস্তিষ্ক-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। বাস্তবিক অক্ষয় বাবু কিরূপ দুর্বিসহ মস্তিষ্ক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও

দুঃখের উদ্রেক হয়। তাঁহার হৃদয়ভেদী কষ্ট-কাহিনী পাঠ করিলে নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারা যায় না। "আর্য্যদর্শন" সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে "কোন দেশের কোন পণ্ডিত এরূপ মস্তিষ্করোগে প্রপীড়িত হইয়া মস্তিষ্কেরই চালনা করিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিনা, আমরা কোন স্থানে পাঠ করি নাই এবং কাহারও নিকট শুনি নাই।" তাঁহার কি উজ্জ্বল প্রতিভা, অপরিসীম ধৈর্য্য এবং অসাধারণ অধ্যবসায়,তাহা সামান্য বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য। এই পুস্তকখানি কিরূপ মূল্যবান আদরের সামগ্রী, তাহা সুধীগণের এতদ্-সম্বন্ধীয় মন্তব্য পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যায়। Max Muller ইহা পাঠ করিয়া লিখিয়া পাঠান "আপনি নিজে অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা বহুমূল্য।" মনিয়ার উইলিয়মসও লিখিয়া পাঠান "They (two volumes on the Religious sects of the Hindus) appear to every body a great deal of very interesting information and research They are certainly very creditable to your industry and scholarship and will be a great acquisition in my library (June 13, 1884) প্রসিদ্ধ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া লেখেন —"আপনার উপহার, উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ,প্রাপ্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, বলিতে পারি না। প্রথমতঃ তো উহার প্রকাণ্ড আকৃতি দেখিয়া চক্ষুঃস্থির হইল। তাহার পর উহাতে প্রদর্শিত পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে বাগ্মিতা ও কবিত্ব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। অন্য লোকে সুস্থ শরীরে যাহা না করিতে পারে, আপনি তাহা রুগ্নশরীরে করিয়াছেন।" ইঁহার গ্রন্থগুলি অনেক গ্রন্থের আদর্শস্বরূপ হইয়াছে এবং নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে জ্ঞান বিতরণ করিতেছে,ইহা গ্রন্থ-কর্ত্তার কম গৌরবের বিষয় নহে। যখন শিরোরোগের যন্ত্রণা অধিক বোধ হইত, তখন মধ্যে মধ্যে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামের নির্জ্জন শান্তিময় ভবনে আসিয়া বাস করিতেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয়ে পরম আনন্দানুভব করিতেন এবং যাহাতে জীবনের শেষভাগ প্রকৃতির নিত্য নূতন শোভা সন্দর্শনে অতিবাহিত করিতে পারেন, সেইজন্য প্রকৃতি-সেবক শীঘ্র পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বালীগ্রামে একটী মনোহর পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। উদ্যানটীর দৃশ্য কি মনোমুগ্ধকর! ভাগীরথী কল কল শব্দে একপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, নানা জাতীয় পরম রমণীয় অসা-ধারণ বৃক্ষরাজি শাখায় শাখায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উদ্যানটীকে কি এক স্বর্গীয় পবিত্রতাময় শান্তি-ময় স্থানে পরিণত করিয়াছে,তাহা বর্ণনাতীত, স্বচক্ষে না দেখিলে কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। উদ্যানটীতে প্রবেশ করিবামাত্র দর্শক সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণা সমু-দয় ভুলিয়া যেন এক সুরম্য শান্তিময় তপো-বনে আসিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া বোধ করেন। এই উদ্যানটী ছোট হইলেও প্রকৃত প্রকৃতি-উপাসকের আদর্শ রম্য আরামের স্থান। এই মহাত্মার এইস্থানে জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হয়। এইখানে তিনি বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সেবকগণকে চির-দিনের জন্য শোকসাগরে ভাসাইয়া নিত্য শান্তিধামে গমন করেন। বালীগ্রাম! তুমি

ধন্য, তুমি যে মহাত্মার চরণরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া নিজদেহকে সার্থক করিতে পারিয়াছিলে, সেজন্য সমস্ত বালীগ্রামবাসী তোমার নিকট এক অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। বালীগ্রামে অবস্থিতিকালে ইনি কত দুঃস্থ দারিদ্র্যভার-ক্লিষ্ট পরিবারবর্গের দুঃখমোচন করিয়াছেন এবং কত অনাথা বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহাঁর বাক্য ও কার্য্যনিষ্ঠা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন, যখন যাহা করিতেন, অথবা করিতে মনস্থ করিতেন, তখন কদাপি তাহার অন্যথা হইত না। ইহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও ক্ষমা গুণ ছিল। কোন পুরাতন কর্ম্মচারী তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার দোষ মার্জ্জনা করিতেন। ইনি অনেক গুপ্তদান করিতেন, অনেক দুঃস্থ বালককে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বালীগ্রামে টনসনস্কুল স্থাপন কালে অযাচিত ভাবে দান করেন এবং উত্তরপাড়া ও বালীর স্কুলে সচ্চরিত্র ছাত্রগণকে প্রতি বৎসর উত্তমরূপ পারিতোষিক প্রদান করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন।

১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মহাত্মা ঈশ্বরাভিপ্রেত জীবনের পবিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অমরধামে গমন করেন। চিরদিনের তরে বঙ্গের জ্ঞানসূর্য্য অস্তমিত হইল। বঙ্গভাষা একটী সুসন্তান হারাইলেন। সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহার জন্য শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। মহাত্মার পবিত্রদেহ ভাগীরথীর পবিত্রতীরে আনীত হইল এবং সুগন্ধচন্দন কাষ্ঠে সুসজ্জিত হইলে সর্ব্বভুক ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি নির্ধন, সকলেই দারুণ দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনাবাক্য-পূর্ণ পত্র লেখেন। এখনও সেই সর্ব্বজন-তৃপ্তিকর শান্তিদায়ী রমণীয় উদ্যান বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত উদ্যান-পালকের অভাবে ইহার সে শ্রী কই? ইহাতে সে স্বর্গীয় শান্তি কই? ইহা এখন দর্শকের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া দুঃখ আনয়ন করে মাত্র। কোন প্রতিমূর্ত্তি কিম্বা প্রস্তরফলক এরূপ মহৎজীবনের স্মৃতিরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, কারণ তাহা দ্বারা এরূপ প্রতিভা ও মহত্ত্বের বিকাশ কিরূপে সম্ভবে? প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে ও প্রত্যেক লোকহিতকর কার্য্যে ইহাদের স্মৃতি যে সূত্রে বিজড়িত, তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন বঙ্গবাসীর নাম ভারত-ইতিহাসে স্থান পাইবে, ততদিন এই মহাত্মার জীবনের মহৎক্রিয়া-কলাপ ও সংগ্রন্থাদি বঙ্গবাসীগণের পবিত্র মানসপটে তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে।*

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বালী "শান্তি-কুটির লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত-স্মৃতি-সমিতির অনুষ্ঠিত, সন ১৩১৩ সাল, ১লা শ্রাবণের সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মানব সমাজ। (২)

সমাজতত্ত্ব মানবতত্ত্বের এবং মানবতত্ত্ব জীবতত্ত্বের অধীন। জীবতত্ত্ব বিশ্বতত্ত্বের একাংশ মাত্র। এই নিমিত্তই বলিয়াছি যে, বিশ্ব হইতে পৃথক করিলে মানবকে বুঝা যাইবে না।* মানব যুগ যুগান্তর হইতে সমস্ত বিশ্বের ঘাত প্রতিঘাত দেহে ও মনে বহন করিতেছে, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সকলই তাহাকে নিয়মিত করিতেছে। জলবিন্দু হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, তৃণ হইতে ভূধর পর্য্যন্ত, বাষ্প হইতে ঝটিকা পর্য্যন্ত, অন্ধকার হইতে আলোক পর্য্যন্ত, উদ্ভিদ হইতে কীট পতঙ্গ, পক্ষী ও পশু পর্য্যন্ত, নীহারিকা হইতে জ্যোতিষ্মণ্ডল পর্য্যন্ত—সকলেই মানবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।† কেবল মানবের দেহ নহে, তাহার স্বভাব, তাহার আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি সকলই উহাদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। নদীবহুল দেশের জনগণের স্বভাব একরূপ, সমুদ্রতীরবাসিগণের অন্যরূপ, এবং পার্ব্বত্যগণের স্বভাব আর একরূপ হইয়া থাকে, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। পার্ব্বত্যগণের মধ্যে কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তান অধিক জন্মে। সমতলবাসীদিগের মধ্যে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। এই এক ঘটনা হইতেই অর্থাৎ স্ত্রী-পুং সংখ্যার ইতর বিশেষ হইতেই সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সংস্কারক সমাজের প্রতি যত অস্ত্রই প্রয়োগ করুন, এ প্রভেদ, এ পরিবর্ত্তন তিনি কোন ক্রমেই নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। তাই বলিয়াছি, মানবকে ইচ্ছানুরূপ ভাঙ্গা গড়া যায় না। সে জড় ও জীব, দ্বিবিধ প্রকৃতির উত্তরাধিকারী। কেবল বংশপরম্পরা জানিলে মানবকে জানা যাইবে না, সুতরাং মানব সমাজকেও বুঝা যাইবে না।

সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজ সমষ্টি হইতেও অধিক।* সমাজের যেন নিজেরই একটা জীবন আছে, এই জীবন আদর্শকে লক্ষ্য করে। আদর্শ ব্যবহারিক জগৎ হইতে অনেক উপরে। ব্যক্তি তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না; কিন্তু যখনই কোন মহাপুরুষ ঐ আদর্শ লইয়া অবতীর্ণ হন, সমাজ অমনই তাহা আত্মসাৎ করে। তাই সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

মানবের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছে "আত্মানং বিদ্ধি" "Know thyself" মানবের বিজ্ঞান বলিতেছে, সকল আলোচনা অপেক্ষা আপন তত্ত্ব অবগত হওয়াই মানবের অধিক প্রয়ো-

---

* Man is hold to be a part of Nature, a product of the definite and orderly evolution which is universal, a being resulting from and driven by the one great mechanism which we call Nature Kingdom of Man, p 7

† The physical conditions of a country, including the climate, the vegetation and the indegenous animals, affect the lives of the human inhabitants of that country Haddon's Study of Man, Introduction, p xvii.

* Human societary unit is a new synthesis * * *—a unity with distinctive mode of benaviour, with a whole that is more than the sum of its parts; in short with a life and mind of its own. Thomson's Heredity, p 510.

জনীয়।* আপনাকে না চিনিলে, আপনাকে না বুঝিলে মানবের বন্ধ-মুক্তির উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে চিনিতে হইলে বিশ্ব-প্রকৃতিকে চিনা চাই। তাই বলিয়াছি, মানবকে, মানবসমাজকে চিনা, বুঝা এত কঠিন। সমাজের দুর্ভাগ্য এই যে, যাঁহারা মানবকে চিনিবার চেষ্টা করিবেন, চিরদিনই তাঁহারা সমাজের নেতৃত্বকে তুচ্ছ করিয়া আসিতেছেন। এক দেশে নয়, সর্ব্ব দেশেই এইরূপ, যাহারা প্রকৃতিকে বুঝে না, তাহারা মানবকে বুঝিবে কেমন করিয়া? দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায় সর্ব্ব দেশেই এই শ্রেণীর অজ্ঞ লোক সমাজের নেতৃত্বপদ অধিকার করিয়া আসিতেছে।† তাই সমাজ মানবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা বন্ধ-মুক্তি। কিন্তু তাহা মানবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নহে। মানবকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। ব্যক্তিগত মানব, সামাজিক মানব, রাজনৈতিক মানব, ধর্ম্মনৈতিক মানব, অর্থনৈতিক মানব—মানব এরূপ টুকরা টুকরা হইবার বস্তু নহে। পারিবারিক মুক্তি হইল, সামাজিক মুক্তি হইল না; সামাজিক মুক্তি হইলে, রাজনৈতিক মুক্তি হইল না; রাজনৈতিক মুক্তি হইল, ধর্ম্মনৈতিক মুক্তি হইল না—এরূপ হইতেই পারে না। ইহা ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব, সমাজের পক্ষেও অসম্ভব। ব্যক্তির মুক্তি আত্মজ্ঞানে, সমাজের মুক্তিও আত্মজ্ঞানে। ব্যক্তির সহিত সমাজের সাদৃশ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায় আত্মজ্ঞানহীন সমাজও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে সমাজ আপনার গঠন ও শক্তি, আপনার চিরাগত প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যায়, জগতে তাহার স্থান নাই। সে ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই। যে আপনাকে চিনে, অমৃতের অধিকারী সে-ই হয়, অপরের তাহাতে অধিকার নাই।

সমাজকে প্রকৃতরূপে বুঝা, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করা, ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় দুঃসাধ্য। ইহাকে বুঝি অথচ বুঝিও না। নাহংমন্যে সুবেদেতি নোনবেদেতি বেদচ।* সমাজকে বুঝি, ব্যবহারিক হিসাবে। পরমার্থতঃ বুঝিতে হইলে সমাজতত্ব শাস্ত্রই প্রণীত হইতে পারিত না। সকল মানবেরই এক একটা সাধারণ ধর্ম্ম আছে। তাহা লইয়াই একটা অপূর্ণ সমাজ-তত্ব রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে আজিও প্রকৃত পক্ষে জীব তত্বের সহিত একীভূতও করা হয় নাই। মানব সবই শিখিতে চায়; শিখা অত্যাবশ্যকও। কিন্তু মানব কেবল মানবতত্বই অবহেলা করিয়া আসিতেছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। সমাজকে বুঝিতে, সমাজের বিধি নিয়ম প্রণয়ন করিতে, ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, কখনই বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সামাজিক ইতর জন্তু হইতে মানব সমাজ পর্য্যন্ত সকলকেই মনোমধ্যে অঙ্কিত রাখিতে হইবে। পিপীলিকা,

* After all we are of more interest to ourselves than any study can be. The study of Man, Introduction, p xxiv.

† Even at the present day, in some civilized states, a body of clerks without any pretence to an education in the knowledge of Nature, headed by gentlemen of title equally ignorant, are intrusted with and handsomely paid and rewarded for the superintendence of the armies, the navies, the agriculture, the public works, the fisheries and even the public education of the states. Kingdom of Man, p 48.

* নিতান্তই বুঝি না যে তাও সত্য নহে। বুঝি যে এমন কথা কার সাধ্য কহে। জানিনা তবু জানি।
উপনিষদ গ্রন্থাবলী, পৃঃ৬৯।

মধুমক্ষিকা, ইহারা সমাজবদ্ধ হয় কেন? বহু তীর্থযাত্রী একত্র তীর্থে গমন করে, তাহারাও মানব সমষ্টি। কিন্তু তাহাদিগকে সমাজ বলা যায় না কেন? এই বিষয় চিন্তা করিলেই সমাজের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সমাজবদ্ধ জীব পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধন করে, এবং তন্নিমিত্ত একে অন্যের সহায় হয়। সমাজকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে দুর্ব্বলকে সবলের হস্ত হইতে উদ্ধার করা, পরস্পরের জীবন-ব্যাপারের অনুকূল কার্য্য করা এবং প্রতিকূল কার্য্য হইতে বিরত হওয়া, এক কথায় পরস্পরের প্রতি সমবেদনা অনুভব করা—ইহাই সমাজের প্রধান লক্ষণ এবং উপকারিতা।* যদি পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধন ও সহায়তা না হইল, তবে সমাজের অন্য কোনও অর্থ নাই। এস্থলেও ব্যক্তিকে স্মরণ রাখিতে হইবে, সমাজের প্রত্যেক বিষয়েই ব্যক্তিকে স্মরণ রাখিতে হয়। ব্যক্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার জীবনব্যাপারের অনুকূল; সমাজেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তির কোন এক স্থানে আঘাত লাগিলে সর্ব্বশরীরেই বেদনা অনুভব হইয়া থাকে, সমাজেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীবন ব্যাপারের অনুকূল হয় না, সে রুগ্ন; যে ব্যক্তির এক স্থানে আঘাত লাগিলে সর্ব্বত্র বেদনা অনুভূত হয় না, সে পীড়াগ্রস্ত, সে মৃত্যুমুখে পতিত। সমাজেরও তাহাই। যে সমাজে এক ব্যক্তির বিপদে অন্যান্য ব্যক্তিগণ বেদনা অনুভব করে না, যেখানে সমাজের এক অংশ সমস্ত সমাজের উপকারে আসে না, যে সমাজ রুগ্ন, সে সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত।

* Ency. Brit, vol 8, p 620.

তাহাকে সুস্থ অবস্থায় আনিতে পারিলে রক্ষা হইবে, নচেৎ নহে।

মানব সামাজিক জীব। সামাজিকতার ফল যেমন পরস্পরের নিকট হইতে উপকার লাভ, তেমনই বিবিধ মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন। যে সমস্ত সদ্‌গুণ মানবের হৃদয়ে দেবত্ব আনিয়াছে, তাহা সামাজিকতারই ফল। আত্মরক্ষা, অপত্যরক্ষা, সমাজের প্রবর্ত্তক কারণ; এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি, ন্যায় ও কর্ত্তব্যজ্ঞান, সমদর্শীতা ও স্বার্থত্যাগ, তৃপ্তি ও সুখ বৃদ্ধি, সমাজ-বন্ধন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।† এস্থলে ব্যক্তির বাল্যজীবন হইতে মানবের প্রাথমিক অবস্থা অনুমিত হইতে পারে। বালক কেবল আপনাকেই বুঝে, তাহার আপনারটী ষোল আনা বহাল থাকা চাই, বালক বড়ই স্বার্থপর। কিন্তু যখন ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই বালক নানা জনের সংসর্গে আসে, তখন পরার্থের নিকট স্বার্থকে বলী দিতে ক্রমে অভ্যস্ত হয়। সামাজিক মানবও তদ্রূপ। কেবল স্বার্থ দেখিলে সমাজ চলেই না। সামাজিক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণ পরার্থ দেখিতে বাধ্য।

বলিয়াছি, মানব সমস্ত জীবের উত্তরাধিকারী। তাই অসামাজিক মানবেতর ধর্ম্ম সকলও মানবে বর্ত্তমান আছে। উন্নতবৃত্তি সকল তাহাদিগকে দমিত রাখিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিতে পারে না। তাই সমাজবদ্ধ মানবও কখন কখন অসামাজিক স্বার্থসেবী ভাব কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সমাজের এবং ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপে সামাজিক অপরাধ উৎপন্ন হয়। ইহা মানব হৃদয়ে নিদ্রিত পশুভাবের পুনরাবৃত্তি। এই নিমি-

* Ency. Brit. p 619.

তই অপরাধিগণকে অধ্যাপক টমসন অতীত কালের পুনরাবৃত্তি বলিয়াছেন। * সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বকালের ভাব অর্থাৎ স্বার্থ, আত্ম-সেবা ইহাদিগকে অদ্যাপি পরিচালিত করে। এই অবস্থাতেই সামাজিক অবনতি। দণ্ড ইহার একমাত্র প্রতিবোধক নহে, অথবা প্রধান প্রতিবোধকও নহে। এ কথা পরে বুঝা যাইবে।

ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ বাল্য, যৌবন, জরা ও মৃত্যু আছে, সামাজিক জীবনেও তাহাই। ব্যক্তির জীবনে যেমন কর্ম্মই এক মাত্র লক্ষণ, সামাজিক জীবনেও তাহাই। কর্ম্মের ভাব জীববিবর্ত্তনের সহিত ইতর প্রাণীদিগের নিকট হইতে মানব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাই বা বলি কেন? ব্যক্ত চৈতন্যের তো কর্ম্মই একমাত্র লক্ষণ, কর্ম্ম জীবনের সহজাত ব্যক্তি। তাই অধ্যাপক লোয়েব্ বলিতেছেন, "One of the most important instincts is usually not even recognized as such, namely the instinct of workmanship" * অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি মানবের সহজাত ধর্ম্ম। হিন্দুর গীতাও এই শিক্ষা দিতেছে। ব্যক্তি এবং সমাজের উভয়েরই লক্ষণ ও পরিণাম কর্ম্মে। সামাজিকের পরিণাম পরস্পরের সুখকর কর্ম্মে, সমাজ রক্ষার কর্ম্মে। তাহার বিপরীত ব্যক্তির ন্যায় সমাজের মৃত্যু উপস্থিত হয়। যেমন অপরে ব্যক্তির কর্ম্ম কাড়িয়া লইতে পারে, তেমনই সমাজের কর্ম্মও কাড়িয়া লইতে পারে। এইরূপ হইলেই উভয়েরই জীবনের আশা চলিয়া যায়।

শ্রীশশধর রায়।

* Are not many criminals mere anachronism ?—People out of time or out of place, who require not incarceration or worse......Heredity 1908 p, 531.

* Loeb's comparative physiology of the brain, p 197.

বাঙ্গালা ভাষা।

"ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় সম্প্রতি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র অতিরিক্ত সংখ্যায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে 'বাঙ্গালা ভাষা'র আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তাহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষেই শোভা পায়। প্রসঙ্গান্তরে শব্দ বিশেষের মূলতত্ত্বানুশীলন কল্পে তাঁহার মীমাংসিত মন্তব্য সম্বন্ধে বর্ষীয়ান্ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই 'অজ্ঞতা' স্বীকার করিয়াছেন।* সে অবস্থায় 'বাঙ্গালা ভাষা' রূপ গুরুতর বিষয়ে কোন কথা বলিতে যাওয়া আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। তবে, পণ্ডিতেরা যেখানে পশ্চাৎপদ হয়েন, মূর্খ সেস্থানে আগুয়ান হইতে সঙ্কোচ বোধ করেনা; তাই, রায় মহাশয়ের আলোচিত প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া আমরা দুই একটী কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। তিনি "বর্ণবিন্যাসের ও বর্ণের রূপের যে নূতন রীতি" প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, স্বয়ং সাহিত্য-পরিষৎ তৎসম্বন্ধে "কোন মতামত এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই"; আমরাও সে পক্ষে নীরব রহিলাম।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা" আলোচনা †

* প্রবাসী। ৬ষ্ঠ ভাগ। ৯ম সংখ্যা।

† নব্যভারত। ২৪শ খণ্ড। ৩য় সংখ্যা।

উপলক্ষে আমাদিগের স্মরণ হয়, বহুদিন পূর্ব্বে 'নব্যভারত' আশা করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষাই কালক্রমে নব্যভারতের ভাষা হইবে। স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, রায় মহাশয়ের প্রবন্ধেও সেই আশার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবকের পক্ষে ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। কিন্তু এই সার্ব্বজনীনতা সংস্থাপনের জন্য বঙ্গভাষাকে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, তাই রায় মহাশয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষাকে লড়াই করিবার এবং লড়াইতে জয়ী করিবার জোগাড় আবশ্যক।" জোগাড়ের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতেও তিনি ক্রটি করেন নাই ;—"লিখিত ও কথিত ভাষার অতিরিক্ত প্রভেদ" দূর করা এই ব্যবস্থার অন্যতম। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম, "বর্ত্তমান বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে একদল সংস্কৃতশব্দ-বহুল ও অন্যদল গ্রাম্য শব্দ বহুল ভাষাগঠনের পক্ষপাতী।" রায় মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ দলভুক্ত, ঠিক বুঝা যায় না ; তবে ইহা বুঝা যায় যে, তিনি কোন দলেরই চরমপন্থী নহেন—প্রত্যুত, উভয়েরই মধ্যপন্থী। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সকল বিষয়েই সামঞ্জস্য আবশ্যক।" বঙ্গভাষার গঠন কল্পে এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই তিনি অবশ্য "লিখিত ও কথিত ভাষার অতিরিক্ত প্রভেদ" ঘুচাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

লিখিত ও কথিত ভাষায় প্রভেদের অতিরেক দূর করাই তাঁহার অভিপ্রেত ; নতুবা, উভয়ের বিভিন্নতা একেবারে দূর করা সঙ্গত বা সম্ভব কিনা—সন্দেহের বিষয়। কোন দেশের কোন ভাষার লিখিত ও কথিত রূপ অবিকল একবিধ বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষেইরই কথিত 'প্রাকৃত' কি লিখিতে 'সংস্কৃত' হয় নাই?—Yorkshire এর গ্রাম্যভাষা (patois) কি literary English এ ব্যবহৃত হয়?—ভট্টাচার্য্য ঠাকুরাণীর ভাষা গৃহস্থালির "নানা কাজে" যথেষ্ট উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড ব্যাখ্যাকালে বা মেঘদূতের রসমাধুর্য্য আলোচনার সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পক্ষেও সেই ভাষা ব্যবহার্য্য কিনা, তৎপক্ষে মতভেদ থাকা অসম্ভব নহে। উল্লিখিত patios অর্থেই, বোধ হয়, রায় মহাশয় 'ভাখা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যদি আমাদের অনুমান ঠিক হয়, তবে লিখিত ভাষায় ভাখার ন্যূনতা সাধন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় বটে। বর্ত্তমান লিখিত বঙ্গভাষাতেও তাহার ন্যূনতার লক্ষণ ও উপকারিতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের বিপিন, চট্টগ্রামের নবীন, ঢাকার কালীপ্রসন্ন, ফরিদপুরের দেবীপ্রসন্ন, বাঁকুড়ার রামানন্দ, বর্দ্ধমানের পঞ্চানন্দ, স্ব স্ব গ্রাম্যভাষায় কথা কহিলে পরস্পর বিলক্ষণ বিসদৃশ বোধ হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহাদিগের সকলের লিখিত ভাষায়, একই রূপ, একই ছাঁদ, প্রতীয়মান হয়—তাহাতে তাঁহাদিগকে রাজধানীর সন্নিহিত অক্ষয়চন্দ্র ও চন্দ্রনাথের সহিত একই বঙ্গমাতার সুসন্তান বলিয়া চিনিয়া লইতে কোন সন্দেহ জন্মে না।

লড়া'য়ে জয়ী করিবার জন্য জোগাড়ের মধ্যে, রায় মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে, "বাঙ্গালা ভাষা শেখা সহজ করিতে হইবে, উহাকে সুশ্রী ও অন্যের লোভনীয় করিতে হইবে।" ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা আর হইতে পারে না। কিন্তু ভাষার ওজস্বিতা ব্যতিরেকে উহার পারিপাট্য সাধন ও অন্যের চিত্তাকর্ষণ করা সম্ভব বোধ হয় না। সম্প্রতি মেঘদূতের

কোন পদ্যানুবাদ সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, অনুবাদকের "ভাষা ভাল, ব্যাখ্যাও সরল হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ছন্দ এবং শব্দ নির্ব্বাচনের ফলে মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বড় শুনিতে পাওয়া যায় না।" ইহা দ্বারা বুঝা যায়, গুরুগম্ভীর ধ্বনির অভাবে, নির্ভুল ও সরল ভাষা সত্ত্বেও, বক্ষ্যমান মেঘ মজুমদার মহাশয়ের 'লোভনীয়' হয় নাই। অতএব, ভাষার পারিপাট্য সাধন কল্পে যথোপযোগী সুন্দর শব্দ নির্ব্বাচনকুশলতা আবশ্যক। এই শব্দনির্ব্বাচনে ভট্টাচার্য্য কর্ত্তার বা তাঁহার গৃহিণীর অনুসরণ করিব, ইহাই সমস্যা। রায় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন, "আমাদের মত খুঁট আখরোর নিস্তার কোনদিকেই নাই।" তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি, কর্ত্তাগৃহিণী উভয়ের ভাষারই ক্রিয়াপদগুলি প্রায় এক, অতএব, গৃহিণীর ভাষা 'বাঙ্গালা' পদবাচ্য হইলে, কর্ত্তার ভাষাকেও তৎশ্রেণীস্থ মনে করিয়া একের ভাষা 'আটপহুরিয়া' ও অন্যের ভাষা 'পোষাকি' রূপে ব্যবহার করায় বিশেষ প্রত্যবায়ের আশঙ্কা দেখা যায় না। তবে, সকল বিষয়ের ন্যায়, এ বিষয়েও সামঞ্জস্য আবশ্যক; কথায় কথায় কর্ত্তার "নবজলধর পটলসংযোগে" যেমন শ্রুতিকটু, সেইরূপ সময়ে অসময়ে গৃহিণীর "হেঁশেলে ব্যন্নন সম্বরা"ও অরুচিকর। গৃহিণীর প্রত্যেক শব্দের গোড়ায় "সংস্কৃতের ঘ্রাণ আছে" বলিয়াই যে তাহা অবাধে পণ্ডিতসভাতেও চালাইতে হইবে, অথবা কর্ত্তার "কণ্ঠে দেবভাষা" বিরাজমানা বলিয়াই যে গৃহাঙ্গনেও তদীয় ঘরট্টপেষকের ঘর্ঘরধ্বনিতে কর্ণপটহ নিনাদিত করিতে হইবে,—এরূপ নিয়ম বাঞ্ছনীয় নহে।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা আবশ্যক। কর্ত্তার ভাষা বা গৃহিণীর ভাষা—যাহাই অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির হউক, তদনুসারেই চলা উচিত; কিন্তু উভয়ের 'খিচুড়ি' বাঞ্ছনীয় কি না?—স্বর্গীয় সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত মহাভারতের ভাষার সঙ্গে হুতুমী ভাষার সংযোগ সঙ্গত কি না? আমরা যে মুহূর্ত্তে দেখি, "নবপ্রশস্তি *** স্নায়ুচক্রটাকে উত্তরোত্তর বুভুক্ষু বলিয়া" তুলে, তাহার পর মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাই, "ভোগের স্পৃহা অল্প সানায় না।"* এই "সানায়"টী, বোধ হয়, রায় মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট একটী 'ভাখা,' "বুভুক্ষু স্নায়ুচক্র" বা "ভোগের স্পৃহা"র সহিত উহার সংযোগ তাঁহার বা অন্য কোন ভাষা-সংস্কারকের অনুমোদিত কি না, জানিতে আমাদিগের কৌতূহল জন্মে।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা" শীর্ষক পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম, সংস্কৃত ও ইংরাজি এই উভয় ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা রচনার অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। রায় মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যের পক্ষেও বাঙ্গালা ভাষা শেখা সহজ করিতে হইলে সেই উপায়ই প্রকৃষ্ট বোধ হয়। আমরা অবশ্য সভামণ্ডপে ব্যবহার্য্য, সুশিক্ষিতের পাঠ্য, স্থায়ী সাহিত্যের উপযোগী, ভাষার কথাই বলিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে ঐ দুই ভাষা শিক্ষা বাঙ্গালার ছাত্রগণের পক্ষে যেরূপ প্রায় অপরিহার্য্য, হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ছাত্রগণের পক্ষেও প্রায় তদ্রূপ। অতএব, কেবল,বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের যথোচিত জ্ঞান লাভ করিলেই, সকল প্রদেশের অন্ততঃ হিন্দু শিক্ষার্থিশের পক্ষে ইংরাজি ও সংস্কৃতের সাহায্য-গঠিত বঙ্গভাষা শিক্ষার পথ সুগম হওয়া সম্ভব, এবং তদ্দ্বারা

* প্রবাসী। ৮ম ভাগ। ৯ম সংখ্যা। ৫০৩ পৃষ্ঠা।